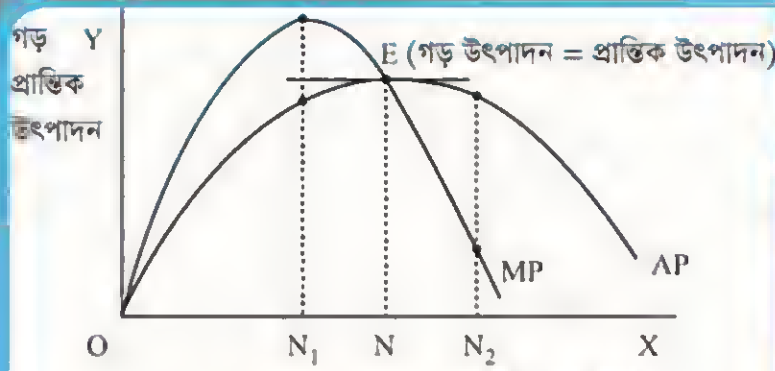
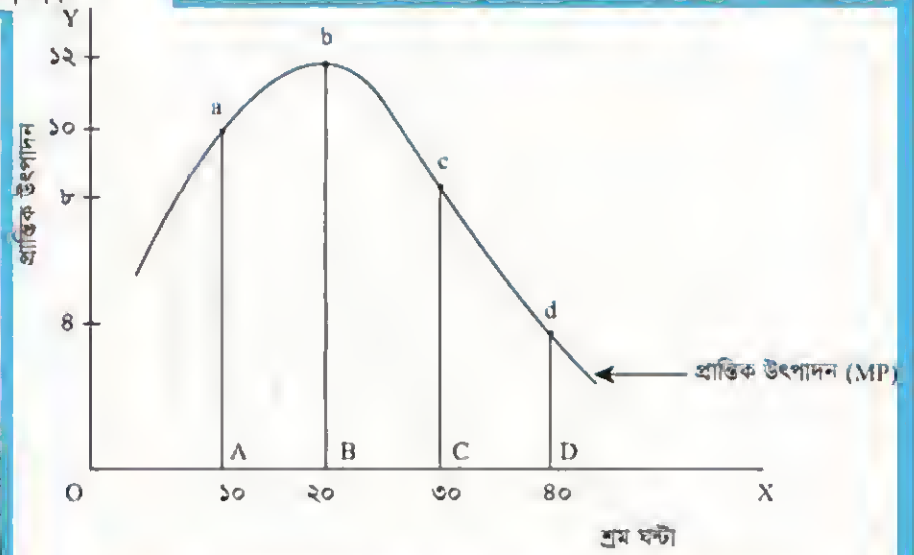


অর্থনীতি

নবম-দশম শ্রেণি



গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক



ক্রমবাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত

অর্থনীতি

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার

ড. মোঃ আজম খান

মোহাম্মদ ফখরুল আলম

সম্পাদনা

প্রফেসর মুহম্মদ ইসমাইল হোসেন

প্রফেসর মোঃ আমির হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
দিলরুবা আহমেদ

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণে

সুদর্শন বাহার

সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার মেকাপ এন্ড এডিটিং

পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রাঃ) লিঃ

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বরূপ-প্রকৃতি অবহিত হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অতীব জরুরি বিষয়। সেই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে নবম-দশম শ্রেণির অর্থনীতি শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে আধুনিক অর্থনীতির পরিচয় ও গুরুত্ব থেকে শুরু করে উপযোগ, চাহিদা, উৎপাদন, বাজার, ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারের অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রায় সকল উপাদান সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনে সহায়ক হবে। বানানোর ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি বৌদ্ধিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমীক্ষা ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে— যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও কর্ম-অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জ্ঞানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	অর্থনীতি পরিচয়	১-১১
দ্বিতীয়	অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ	১২-২২
তৃতীয়	উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য	২৩-৩৫
চতুর্থ	উৎপাদন ও সংগঠন	৩৬-৪৭
পঞ্চম	বাজার	৪৮-৫৮
ষষ্ঠ	জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ	৫৯-৬৭
সপ্তম	অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	৬৮-৮৪
অষ্টম	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৮৫-৯৯
নবম	বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ	১০০-১১৪
দশম	বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা	১১৫-১৩০

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতি পরিচয়

Introduction of Economics

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে। মানুষ আজীবন নানাবিধ বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলে। মানুষের চলার পথের সমস্যা বা বাধা অতিক্রম করতে অর্থনীতি বিষয় নানাতাবে সহায়তা করে। মানুষ, সমাজ বা দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে অর্থনীতি বিষয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতি বিষয় সম্পর্কে জানা বা শেখা সেজন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ; প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা; অর্থনীতির সংজ্ঞা ও নীতি; আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব
- দুশ্রান্ত্যতা ও অসীম অভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- অর্থনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- অর্থনীতির প্রধান দশটি নীতি বর্ণনা করতে পারব
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা মূল্যায়ন করতে পারব

অর্থনীতি পরিচয়

১.১ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

আজকের যে অর্থনীতি আমরা পড়ি তা পূর্বে এতটা গোছালো ছিল না। সনাতন বা আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজসরল। খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় এবং বাড়িঘর— এসবই ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা। দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময়ের রীতি ছিল খুব সীমিত। মূলত মানুষের কার্যিক পরিশ্রম ছিল উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ। মুসা নবীর সময়ে অর্থাৎ ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব হিব্রু (Hebrew) সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থে বা দর্শনের বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ে অগোছালোভাবে কিছু আলোচনা হয়। আয়, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, অর্থনীতি তখন একসঙ্গে আলোচিত হতো। অর্থনীতি বিষয়ের আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো গ্রীক চিন্তাবিদদের চিন্তা ভাবনা, রোমান আইন এবং খ্রীষ্টধর্ম। গ্রীসে প্রথম এরিস্টটলসহ অন্যান্য গ্রীক দার্শনিক ব্যক্তিমালিকানার ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং ভূমির উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসে এরিস্টটলকে প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শ্রমবিভাজন, ব্যবসা এবং অর্থের ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রীক সভ্যতা মূলত নগররাষ্ট্র ভিত্তিক সভ্যতা। দাসপ্রথা ছিল সে যুগের একটা স্বীকৃত বিষয়। শহরের অধিবাসীরা ছিল মূলত ব্যবসায়ী এবং মিস্ত্রি। অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ Economics গ্রীক শব্দ *Oikonomia* থেকে এসেছে। *Oikonomia* অর্থ গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা (*Management of the Household*)। প্লেটো (৪২৭ - ৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব) এবং এরিস্টটল (৩৮৪ - ৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব) ছিল গ্রীক সভ্যতার বিখ্যাত দুই চিন্তাবিদ। এ দুজন চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমিকের মজুরি, দাসপ্রথা ও সুদসহ অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রোমানরা সামরিক এবং সফল রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে অধিক পরিচিত। রোমানরা মূলত গ্রীকদের দেওয়া অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে নিজেদের করে নেয়। রোমান সমাজে কৃষিকে অত্যন্ত মহৎ এবং সম্মানজনক পেশা হিসেবে মনে করা হতো। রোমান দার্শনিকরা অর্থ লব্ধি করাকে বা অর্থ সুদে খাটানোকে খুনের সমান অপরাধ বলে মনে করতেন।

প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বে কোটিল্যুর ‘অর্থশাস্ত্রে’ রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৫৯০-১৭৮০) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে তাকে ‘বাণিজ্যবাদ’ (Mercantilism) বলা হয়। দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বেশি রপ্তানি করত এবং খুব সামান্যই আমদানি করত। ইংল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে মূল্যবান ধাতু (সোনা, রূপা, হীরা ইত্যাদি) আমদানি করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরা সে দেশের ধনী মানুষের বিলাসী জীবনযাপন, অতিরিক্ত করারোপ এবং ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ (Physiocracy) মতবাদ প্রচার করেন। ভূমিবাদীদের মতে, কৃষিই (খনি ও মৎস্যক্ষেত্রসহ) হলো উৎপাদনশীল খাত। অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ই অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে মনে করা হতো।

এভাবেই প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অগোছালোভাবে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা হয়। অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” রচনা করেন। আজকের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো স্মিথের এ বই।

কাজ : অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ ধারাবাহিকভাবে লিখ।

১.২ দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা : দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব

মানুষ যা চায় তার সবকিছু পায় না। মানুষের এ চাওয়ার নাম অভাব। মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি একজন শিক্ষার্থী। ধরো, তোমার কাছে এক হাজার টাকা আছে। তোমার সার্ট, প্যান্ট এবং ভালো জুতা দরকার। এভাবে দেখা যাবে তোমার অনেক কিছু দরকার। কিন্তু তোমার আছে মাত্র এক হাজার টাকা। তোমার প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অনেক কম। অর্থনীতিতে এটাকে ‘সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা’ বলে। দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মানুষ গুরুত্ব অনুযায়ী পছন্দ বা নির্বাচন করে। পছন্দ করার প্রয়োজন না হলে অর্থনীতি বিষয়েরও প্রয়োজন থাকত না।

দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব (Scarcity and Unlimited Wants)

চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়াই মানুষের মূল সমস্যা। যে কোনো দ্রব্য (যেমন: বই) বা সেবাসামগ্রী (চিকিৎসা সেবা) উৎপাদন করতে সম্পদ দরকার হয়। কিন্তু “সম্পদ সীমিত”। সীমিত সম্পদ দিয়ে সীমিত দ্রব্য বা সেবা পাওয়া সম্ভব। সে জন্যই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সব অভাব পূরণ হয় না। দুষ্প্রাপ্যতার কারণ এটাই। সম্পদ অসীম হলে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হতো না। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এল. রবিন্স বলেন “অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে।” অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসনের মতে সম্পদ সীমিত বলেই সমাজে সম্পদের সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহারের প্রগতি গুরুত্ব পায়। সূর্যের আলো, বাতাস ইত্যাদি প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিসগুলোর চাহিদা অনেক। কিন্তু এগুলো পেতে আমাদেরও তেমন কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না। এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণত অভাব দেখা দেয় না। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

১.৩ অর্থনীতির ধারণা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধিও অনেক বেড়েছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয় এখন অনেক উন্নত বা সমৃদ্ধ। প্রথমে যারা অর্থনীতি বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন এদের মধ্যে এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে মনে করেন। এদের মধ্যে এ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। অর্থনীতির এই ধারা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত।

এ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা : “অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।” ‘সম্পদকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। তাই সম্পদ আহরণই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য। স্মিথের সংজ্ঞার দুর্বলতা হলো : ১. অর্থনীতি মানুষের অসীম অভাবকে কিভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে মেটাতে, এই সংজ্ঞায় তার উল্লেখ নেই। ২. এই সংজ্ঞায় সম্পদের উপর অধিক জোর দেওয়া হলেও মানুষ ও তার কাজ-কর্মকে অবহেলা করা হয়েছে। ৩. সম্পদ আহরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও কী উপায়ে সম্পদ যোগাড় করা হবে তা বলা হয়নি। ৪. এই সংজ্ঞায় সম্পদ বলতে দ্রব্যকেই বোঝানো হয়েছে কিন্তু সেবা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

অধ্যাপক মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল সম্পদের চেয়ে মানবকল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, “অর্থনীতি মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।” অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপার্জন এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয়। অর্থাৎ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।

মার্শাল শুধু মানুষের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমানে স্বল্পতার সমস্যাই অর্থনীতির মূল সমস্যা। মার্শালের সংজ্ঞায় মানুষের এ মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়নি।

অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মতে, “অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।” এ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। ২. অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত। ৩. অসীম অভাবকে কিভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায় তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। ৪. সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়। ৫. অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

রবিন্সের সংজ্ঞাটির সমালোচনা : ১. রবিন্স অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। ২. মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এমন কিছু পছন্দ করে যা অর্থনীতিতে আলোচনা হয় না। ৩. অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য যে মানব কল্যাণ তার উল্লেখ নেই। ৪. রবিন্সের সংজ্ঞায় অর্থনীতির সামাজিক অবস্থাকে আলোচনা করা হয়নি। ৫. আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার সংজ্ঞায় আসেনি। ৬. রবিন্স অর্থনীতিকে শুধু মূল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু জাতীয় আয়, নিয়োগ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ ইত্যাদি আলোচনা করেননি। সবশেষে বলা যায় রবিন্সের সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত জটিল। অর্থনীতিতে কোনো তত্ত্বই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার পরেও রবিন্সের সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

১.৪ অর্থনীতির দশটি নীতি

আমাদের সমাজে সম্পদ স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অসীম অভাব মোকাবেলা করতে হয়। অর্থনীতিবিদ ফ্রেগরি ম্যানকিউ এর মতে অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণাসমূহের আলোচনার পূর্বে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতি জানা প্রয়োজন। এগুলো হলো-

১। মানুষ দেওয়া-নেওয়া করে (People Face Trade-Offs)

পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে সব সময় ব্যয় কর তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে পড়া থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ তুমি যদি টিভি দেখ তবে খেলাধুলার পেছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না। সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে তবে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমায়। অর্থাৎ সমাজে মানুষ একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) বিকল্প অবস্থা বেছে নেয়।

২। সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

তুমি যদি স্কুলে লেখা পড়ার জন্য সময় ব্যয় কর তবে তুমি তোমার বাড়িতে তোমার বাবার কাজে সাহায্য করতে পারবে না। অর্থাৎ তুমি বাড়িতে কোনো একটি অর্থনৈতিক কাজ করলে তা থেকে তোমাদের পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারত। কিন্তু সে সময় তুমি স্কুলে লেখাপড়া করছো। এখানে লেখাপড়া করার জন্য বাড়িতে কাজ করতে না পারা লেখাপড়ার সুযোগ ব্যয়।

৩। মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে (Rational People Think at the Margin)

মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে। বিয়েবাড়িতে খাওয়া শেষে তোমরা কেউ কেউ ভাবো আরও একটু খেতে পারতাম, আবার কেউ কেউ ভাবো আর একটু কম খেলে ভালো হতো। এই অল্প একটু বেশি বা অল্প একটু কম খাওয়া হচ্ছে প্রান্তিক খাওয়া। ধরো, তুমি একটি বিষয়ে A পেলে, তোমার মনে হবে আরেকটু পড়লেই A+ পেতে। মানুষ প্রান্তিক সুবিধা-অসুবিধার কথাও ভাবে। ধরো, তুমি পর পর তিনটি কলা খেলে। ৩ নম্বর কলাটি হলো প্রান্তিক কলা। প্রান্তিক কলা খেয়ে তুমি যে তৃপ্তি পেলো তার নাম প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক বা ৩ নম্বর কলাটি পেতে তুমি যত টাকা ব্যয় করলে তার নাম প্রান্তিক ব্যয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে তুমি তখনই প্রান্তিক কলাটি খাবে যখন প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে।

৪। মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় (People Respond to Incentives)

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। তোমার বাবা যদি বলেন তুমি পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫ পেলে তিনি তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দেবেন। নিশ্চয়ই তোমার ভেতরে পড়াশোনা করার উৎসাহ আরও বেড়ে যাবে। তেমনি অর্থনীতিতে শ্রমিক প্রণোদনা পেলে বেশি উৎপাদন করে।

৫। বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় (Trade can Make Everyone Better-Off)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড এবং জাপানের টয়োটা বিশ্বে গাড়ি ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিচিত দুটি কোম্পানি। কোম্পানি দুটির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। কোম্পানি দুটি সাধারণ ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দাম যথাসাধ্য কমিয়ে বাজার দখল করতে চায়। ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হয়; অন্য দিকে মানুষও কম দামে গাড়ি কেনার সুযোগ পায়।

৬। অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তম পন্থা (Markets are Usually a Good Way to Organize Economic Activities)

অর্থনৈতিক কাজকর্ম সংগঠিত হয়ে থাকে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফার্ম ও পরিবারসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ফার্মের মালিকরা বাজারের চাহিদা দেখে দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অসংখ্য পরিবার তাদের আয় ও প্রয়োজন অনুসারে এ সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে।

৭। সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে (Governments Can Sometimes Improve Market Outcomes)

বাজার ব্যবস্থা 'অদৃশ্য হাতের' ইশারায় চলে। কিন্তু সব সময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। নানা কারণে অদৃশ্য হাত সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে। সম্পদের সূষ্ঠ ব্যবহারে অপারগতা, পরিবেশ দূষণ এবং দুর্নীতির মতো বিষয়গুলো থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার হয়।

৮। একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতার উপর (A Country's Standard of Living Depends on Its Ability to Produce Goods and Services)

যেসব দেশের মানুষের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতা বেশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উন্নত দেশসমূহের মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি বলে তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

মাথাপিছু আয় ৫১৭৪৯ মার্কিন ডলার এবং জাপানের মাথাপিছু আয় ৪৬৭৩১ মার্কিন ডলার (উৎস বিশ্বব্যাংক)। ফলে তারা উন্নত খাবার গ্রহণ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভ করে। শ্রমিকদের কর্মক্ষমতাও বাড়ে।

৯। যখন সরকার অতি মাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় (Prices Rise When the Government Prints Too Much Money)

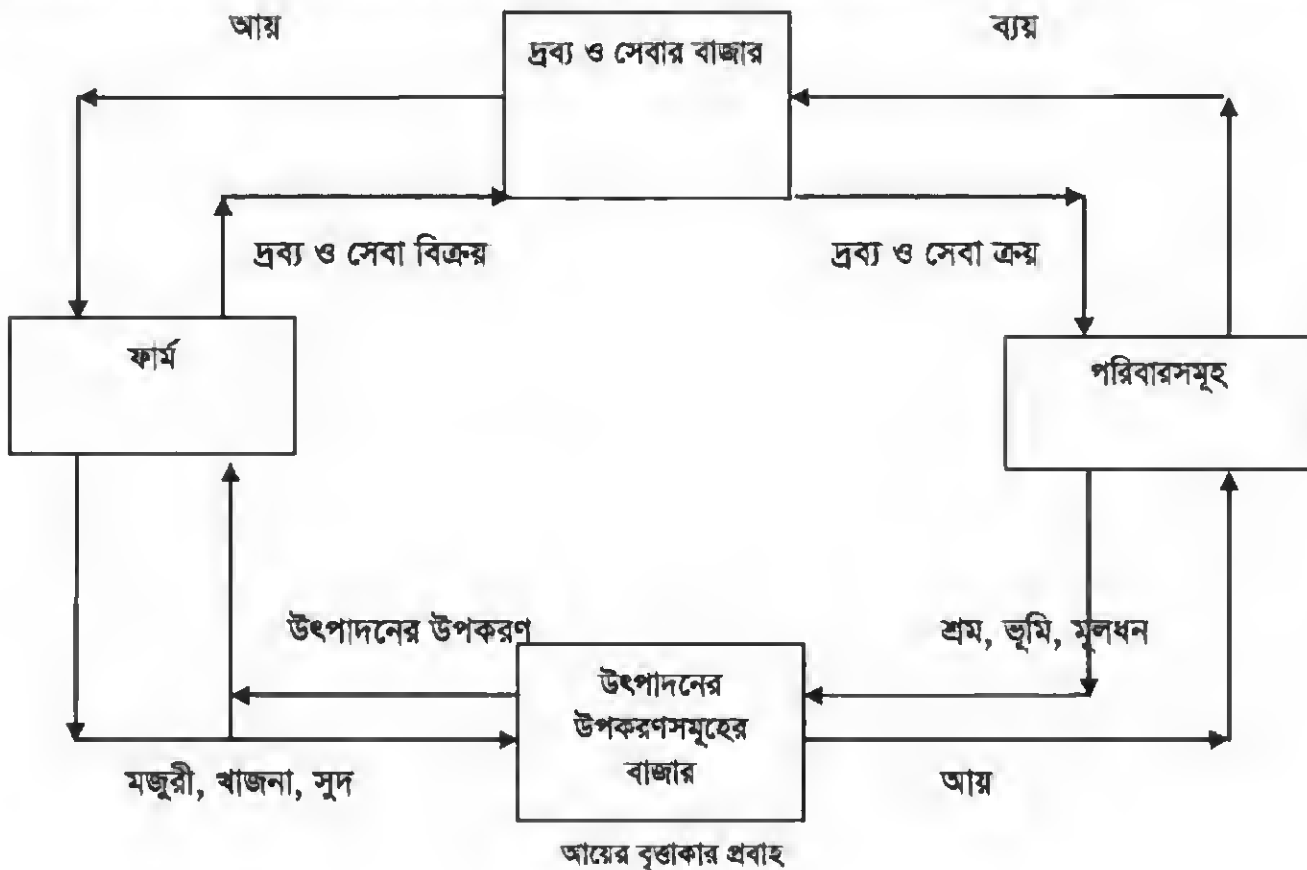
মুদ্রা ছাপানোর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অধিক মাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্যস্তর বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মান বা মূল্য কমে যায়। ধরো, তুমি ৫০০/- টাকা খরচ করলে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে যাও। কিন্তু টাকার মান কমে যাওয়ায় ঐ সামগ্রী পেতে তোমাকে ৬৫০/- টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। যা পূর্বের ৫০০/- টাকার চেয়ে $(৬৫০/- - ৫০০/-) = ১৫০/-$ টাকা বেশি।

১০। সমাজ মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন দেওয়া-নেওয়ার মুখোমুখি হয় (Society Faces a Short-Run Trade-Off between Inflation and Unemployment)

দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না—এরা হলো বেকার। মূল্যস্ফীতি কমলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার বেকারত্ব কমলে মূল্যস্ফীতি বাড়ে।

১.৫ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দুটি খাত)

একটি সরল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি (Agent) থাকে। ভোক্তা বা পরিবার এবং উৎপাদক বা ফার্ম। এই দুই ধরনের প্রতিনিধির মধ্যে আয়-ব্যয় কীভাবে চক্রাকারে প্রবাহিত হয় তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।



১.৬ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করে দেশের কল্যাণ বাড়ানো বিশ্বের সব দেশেরই কাম্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে যে অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, দর্শন, নিয়ম-কানুন ও যে পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্য-কলাপ পরিচালিত হয় তাকে বোঝায়। পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন, ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, গ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা এবং ঘ. ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)

এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারীগণ এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Capitalistic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

- ১। সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা : ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। ব্যক্তি এগুলো হস্তান্তর ও ভোগ করে থাকে।
- ২। ব্যক্তিগত উদ্যোগ : ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এসব উদ্যোগে সরকারের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়।
- ৩। অবাধ প্রতিযোগিতা : এ ব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে অনেক ফার্ম অবাধে প্রতিযোগিতা করে। ফলে দ্রব্যের দাম কম হয় এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।
- ৪। স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা : বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।
- ৫। মুনাফা অর্জন : ধনতন্ত্রে উৎপাদক সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন করে।
- ৬। ভোক্তার স্বাধীনতা : প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও বুচি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে।
- ৭। আয় বৈষম্য : ধনতান্ত্রিক সমাজে বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বেশি থাকে।
- ৮। সরকারের ভূমিকা : এ ব্যবস্থায় সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশরক্ষা, সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেউ নিঃস্বার্থভাবে নয়, বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা নির্দেশমূলক অর্থনীতি (Socialistic or Command Economy)

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধিকাংশ শিল্প কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে। কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে তা সরকার নির্ধারণ করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Socialistic Economy)

- ১। সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অধিকাংশ সম্পদ (জমি, কলকারখানা, খনি ইত্যাদি) ও উৎপাদনের উপাদানগুলোর মালিক হলো সরকার।
- ২। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা : সরকার দেশের উৎপাদন ও বণ্টনসহ অন্যান্য সব কাজ করে থাকে। কেন্দ্র বা সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে সকল পরিকল্পনা করে থাকে।
- ৩। ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব : সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তার সরকার-নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। কোনো ভোক্তা ইচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না।
- ৪। অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব : অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হওয়ায় সেখানে বহু সংখ্যক বেসরকারি উদ্যোক্তার অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না।
- ৫। ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি : সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে জাতীয় চাহিদা ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সবই সরকারের অধীনে থাকে বলে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না।

দলগত কাজ : ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার তুলনা করে উপস্থাপন কর।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economic System):

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। যথা- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, বাংলাদেশ, ভারত ইত্যাদি।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mixed Economy)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলাদা রকমের। সাধারণত মিশ্র অর্থনীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়:

- ১। সম্পদের ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানা : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তি অবাধে ভোগ করতে পারে ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। পাশাপাশি গণদ্রব্য (মহাসড়ক) ও সেবা (স্বাস্থ্যসেবা) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে।
- ২। ব্যক্তিগত উদ্যোগ : মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বণ্টন ও ভোগসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

- ৩। সরকারি উদ্যোগ : মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে।
- ৪। মুনাফা অর্জন : মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি ঋতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।
- ৫। ভোক্তার স্বাধীনতা : এ ব্যবস্থায় ভোক্তা সাধারণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- ধূমপান, মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ ইত্যাদি।

বিশ্বে কোথাও বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র না থাকায় অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করেন।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Islamic Economic System)

ইসলামের মৌলিক নিয়ম-কানূনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : (Characteristics of Islamic Economy)

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ১। মানবজীবনের সামগ্রিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত : ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবজীবনের কোনো বিচ্ছিন্ন বা আংশিক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা না করে মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে।
- ২। মানুষের অধিকার ও দায়িত্বে কোনো বৈষম্য নেই : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্বে কোনোরূপ বৈষম্য নেই। কারণ এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে মর্যাদা এবং জীবন ধারণের পূর্ণাঙ্গ অধিকার দেওয়া হয়।
- ৩। ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে পরিচালনা : ইসলামী অর্থনীতির মূল নীতিমালা ইসলামী শরিয়তের উপর নির্ভর করে। ইসলাম ধর্মের মূল দর্শন, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও রাসুল (স.) এর হাদিসের বিধান মোতাবেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে।
- ৪। মানবকল্যাণে সব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দেশের সমগ্র প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদকে মানুষের আয়ত্তাধীন এবং তার কল্যাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়।
- ৫। সম্পদের আমানতদারি মালিকানা : সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে কেবল স্রষ্টার আমানতদার হিসেবে গণ্য করে। এজন্যই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাফল্য মানুষের চরিত্রে দুর্নীতি ও লোভ সৃষ্টি করতে পারে না।
- ৬। সুদমুক্ত আমানত : ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ গ্রহণের স্বীকৃতি নেই। এখানে ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানতের ব্যবস্থা করা হয়।
- ৭। যাকাত ও ফিতরা : এ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে যাকাত ও ফিতরার মাধ্যমে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে তা দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

কাজ: বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থার সাথে কোন অর্থ ব্যবস্থার মিল রয়েছে? মতামত দাও।

অনুশীলনী

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। কোন সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন?
৩. অর্থনীতির দশটি নীতি আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দুম্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব বলতে কী বোঝায়?
২. এ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও।
৩. আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (চিখাত) বলতে কী বোঝায়?
৪. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?
৫. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতির জনক কে?

- | | |
|-------------------|-------------|
| ক. ডেভিড রিকার্ডো | খ. এরিস্টটল |
| গ. এ্যাডাম স্মিথ | ঘ. এল রবিনস |

২. অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তম পন্থা। কেননা এতে-

- i. দর কষাকষি করা যায়
- ii. সম্ভাব্য ভোগদ্রব্য ক্রয় করা যায়
- iii. চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করা যায়

- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নাবিল বাজারে চিনি কিনতে যেয়ে দেখলেন, চিনির দাম অনেক বেশি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ক্রেতা বলল, রাস্তার ওপারে এই চিনি সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হচ্ছে।

৩. নাবিলের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. ইসলামি | খ. মিশ্র |
| গ. ধনতান্ত্রিক | ঘ. সমাজতান্ত্রিক |

৪. নাবিলের দেশের অর্থব্যবস্থায়-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ক. আয় বৈষম্য দেখা দেয় | খ. সুদবিহীন ঋণের লেনদেন হয় |
| গ. মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে | ঘ. ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রুমি ও তার প্রবাসী বন্ধুর টেলিফোনে কথোপকথন-

রুমি : প্রতিমাসে চালের খরচ বেড়েই চলেছে।

সুমি : আমার মাসিক খরচ সবসময় একই থাকে।

রুমি : তোমাদের দেশে এটি কীভাবে সম্ভব?

সুমি : কেউ ইচ্ছে করলেই এ দেশের দ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে না।

- ক. ভূমিবাদীদের মতে উৎপাদনশীল খাত কোনটি?
- খ. দুঃপ্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়?
- গ. সুমির দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সুমির দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. আসাদ দীর্ঘদিন 'A' দেশে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি দেশে বেড়াতে এসে ছোট ভাইকে তার প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনান। সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। সেখানে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার মালিককে কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়নি। আবার সে তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে।

- ক. এ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ।
- খ. অর্থনীতিতে প্রণোদনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- গ. 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ The Important Ideas of Economics

অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা জরুরি। সম্পদ ও দ্রব্যের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণি বিভাগ, সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন, আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতির মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এ ধারণাগুলো অর্থনীতিকে বুঝতে সহায়ক হবে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা

- অর্থনৈতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ এবং উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে তুলনা করতে পারব
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পদ চিহ্নিত করতে পারব
- দ্রব্য কী তা বর্ণনা করতে পারব
- অবাধলভ্য দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের তুলনা করতে পারব
- মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির খাতওয়ারী তালিকা তৈরি করতে পারব

২.১ অর্থনৈতিক সম্পদ

আমরা সবাই ‘সম্পদ’ শব্দটির সাথে কমবেশি পরিচিত। আমাদের প্রতিদিনের আলোচনায় অনেকভাবে সম্পদ শব্দটি আসে। যেমন মি. সুজন অনেক সম্পদের মালিক। একজন অর্থনীতিবিদের কাছে সব জিনিস সম্পদ নয়। অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংক্ষেপে আমরা এ দ্রব্যগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্যও বলে থাকি। যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। উল্লিখিত জিনিসগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হবে। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয় তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- ১। **উপযোগ :** উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতা। কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে সেই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে। উপযোগ নেই এমন দ্রব্য মানুষ অর্থ দিয়ে কেনে না।
- ২। **অপ্রাচুর্যতা:** কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে। যেমন : নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান প্রচুর। এগুলো সম্পদ নয়। অন্যদিকে জমি, গ্যাস, যন্ত্রপাতি এগুলো চাইলেই প্রচুর পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এগুলো আমাদের কাছে অপরিণীত দ্রব্য।
- ৩। **হস্তান্তরযোগ্য :** সম্পদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর হস্তান্তরযোগ্যতা। হস্তান্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সম্পদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যাবে না। কারণ তার প্রতিভাকে হস্তান্তর বা মালিকানা বদল করা সম্ভব নয়। আবার টিভির মালিকানা বদল করা যায় বলে টিভি সম্পদ।
- ৪। **বাহ্যিকতা :** যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ বোঝায় তা অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। কেননা এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। যেমন : কোনো ব্যক্তির কম্পিউটারের উপর বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিংবা কারো চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পদ বলা যাবে না।

সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার। যথা-

- ১। **প্রাকৃতিক সম্পদ :** প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যে সব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন- ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি।
- ২। **মানবিক সম্পদ :** মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন- শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ।
- ৩। **উৎপাদিত সম্পদ :** প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

কাজ : অর্থনীতির ভাষায় কোনগুলো সম্পদ তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। গম, চাল, কবির প্রতিভা, কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা, মরুভূমির বালি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জনবহুল আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। উন্নয়নের সাথে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে। এ দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-

ক. কৃষি সম্পদ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে পলি সমৃদ্ধ উর্বর কৃষিজমি। আমাদের জমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদনদী প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। এ দেশে প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ একর চাষযোগ্য কৃষিজমি রয়েছে। আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ১৩ ভাগ কৃষি থেকে আসে।

খ. খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। এখানে এ পর্যন্ত যেসব খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। এ পর্যন্ত দেশে ২৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে গ্যাসের মোট মজুদ প্রায় ১৬ বিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে কেবল ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্রগুলো হলো: বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রকীদপুর, সিলেট, তিতাস, বেলাবো (নরসিংদী), মেঘনা, সাজু, সালদা নদী, জালালাবাদ, বিয়ানিবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ফেনী, বিবিয়ানা ও বাঙ্গুরা। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানা ও গৃহে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. **চুনাপাথর :** সিমেন্ট, কাচ, কাগজ, সাবান, ব্রিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেটের ভাগারহাট ও বাগলীবাজার, সুনামগঞ্জের টেকেরহাট, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ এবং চট্টগ্রামের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে।
৩. **চীনামাটি :** ময়মনসিংহের বিজয়পুর ও নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় চীনামাটির মজুদ রয়েছে। এটি বাসনপত্র, সেনিটারি দ্রব্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪. **কয়লা :** বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।
৫. **কঠিন শিলা :** দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুর জেলার রাণীপুকুরে কঠিন শিলার মজুদ রয়েছে। রাস্তা, রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এ শিলা দরকার হয়।

৬. সিলিকা বালু : সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও জামালপুরে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। এটি কাচ, রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৭. গন্ধক : বারুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানা, তেল পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গন্ধক লাগে। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮. খনিজ তেল : সিলেটের হরিপুরে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে।
৯. তামা : রংপুর জেলার রাণীপুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার স্তরে সামান্য তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার, মুদ্রা প্রভৃতি তৈরির জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

গ. বনজ সম্পদ

বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য যে কোনো দেশের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমি মোট ভূখণ্ডের প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। যেমন, আমেরিকায় শতকরা ৩৪ ভাগ, জাপানে শতকরা ৬৩ ভাগ, বার্মায় শতকরা ৬৭ ভাগ এবং ভারতে শতকরা ২২ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সুন্দরবন : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মায়। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এবং বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান পশু-পাখি বাস করে।
২. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি : এ দুটি জেলার প্রায় ১৫,৩৩৩ বর্গকিলোমিটার পাহাড়ি এলাকা জুড়ে এ বন বিস্তৃত। এ বনে সেগুন, গর্জন, গামারি, জাবুল, শিমুল, চম্পা, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।
৩. মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমি : ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় মিলে এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১০৬৪ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি, বনজাম কড়ই প্রভৃতি গাছ জন্মায়।
৪. সিলেটের বনভূমি : এ বনভূমি সিলেট জেলায় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১,০৪০ বর্গকিলোমিটার। এখানে শিমুল, বনজাম, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বহু রকমের গাছ জন্মায়।
৫. দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি : এ বন দেশের উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

ঘ. প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদনদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ ধরনের সম্পদ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। চামড়া শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। এ সম্পদ রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ঙ. শক্তি সম্পদ

কলকারখানা, যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। কয়েকটি উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। এগুলো হলো কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি সামগ্রী।

বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও তা এখনও উত্তোলন করা শুরু হয়নি। সিলেটের হরিপুরে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোলিয়াম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও এ দেশে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে শক্তির যোগান বহুলাংশে প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও প্রচলিত উপকরণ থেকে আসে। আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কলকারখানা, গৃহকর্ম ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করি। এ দেশে পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। একে পানি বিদ্যুৎ বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত। গ্যাস, তেল কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে তাপ বিদ্যুৎ বলে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

১. গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা

২. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া

৩. ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৪. সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নীলফামারী

এ দেশের গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো হলো—

১. সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ

২. আগুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, নরসিংদী

৪. শাহজিবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট

৫. চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এ দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি যেমন, কাঠ, খড়, গোবর, পাটখড়ি, তুষ, পাতা ইত্যাদি থেকেও তাপ শক্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমান সরকার কুইক রেন্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ করা দরকার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বায়ুপ্রবাহ, সৌর তাপ ও জৈব গ্যাসকে শক্তি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আণবিক শক্তির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এসব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

চ. পানি সম্পদ

পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি, যথা : ১. নদনদী, খালবিল, পুকুর ও সমুদ্র, ২. বৃষ্টিপাত এবং ৩. ভূ-গর্ভস্থ পানি।

এ তিনটি উৎসের পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির যোগান কম বা বেশি হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র এলাকায় রয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ। নদীর স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। আমাদের অসংখ্য নদনদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য। নদনদীর পানি ও বৃষ্টিপাত দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়বে।

২.২ দ্রব্য :

দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বুঝে থাকি। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো অবস্তুগত (যেমন- সেবা) হলেও অর্থনীতিতে এগুলো দ্রব্য। অতএব, মানুষের অভাব মিটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে আমরা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে থাকি। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য।

অবাধলভ্য দ্রব্য : যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন- আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক দ্রব্য : যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে মূল্য প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। এদের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বই, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

ভোগ্য দ্রব্য : ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় তাদেরকে ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন, গাড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি।

স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য : যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- ফ্রিজ, গাড়ি, ঘরবাড়ি, জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য : যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য স্বল্পকালে ভোগ করা যায় এবং কোনো ক্ষেত্রে একবার মাত্র ভোগ করা যায় তাকে অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, তরিতরকারি ইত্যাদি।

মধ্যবর্তী দ্রব্য : যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন, কাঁচামাল, রসগোল্লা তৈরির জন্য ব্যবহৃত দুধ ও চিনি মধ্যবর্তী দ্রব্য।

চূড়ান্ত দ্রব্য : যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয়। যেমন- পাউরুটি, চেয়ার ইত্যাদি।

মূলধনী দ্রব্য : যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য, অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য বার বার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলধনী দ্রব্য আবার মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

কাজ : কোনটি কোন ধরনের দ্রব্য তা উল্লেখ কর- আলো, নদীর পানি, টেবিল, জমি, অলংকার, যন্ত্রপাতি।

২.৩ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন

সুযোগ ব্যয় : অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা 'সুযোগ ব্যয়'। মনে কর তুমি একজন শিক্ষার্থী। তুমি কি প্রতিদিন সব কাজ করতে পারবে? যেমন : তুমি একই সঙ্গে অর্থনীতি পরীক্ষা এবং মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে পারবে না। তুমি যদি একটি কাজ করতে চাও তবে অবশ্যই অন্য কাজটি করা সম্ভব হবে না। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, মনে কর তোমাদের এক বিঘা জমি আছে। এ জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। ঐ জমিতে ধান চাষ না করে যদি পাট চাষ করতে চাও তবে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়- এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির 'সুযোগ ব্যয়' (Opportunity Cost)।

নির্বাচন : জসীম একজন কৃষক, তার তিন বিঘার একটি জমি আছে। উক্ত জমির সম্পূর্ণটিতে ধান অথবা গম চাষ করতে পারেন। এছাড়াও জমির কিছু অংশে ধান এবং কিছু অংশে গম চাষ করতে পারেন। উক্ত জমিতে শুধু ধান চাষ করলে ১২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন হতে পারে। আবার শুধু গম চাষ করলে ৮০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হতে পারে। এখন তিনি জমিটিতে কী চাষ করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। ফসল উৎপাদনের জন্য তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই নির্বাচন। অর্থনীতিতে সম্পদের স্বল্পতার জন্যই নির্বাচন করতে হয় এবং এটি ব্যক্তি পর্যায়ে পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদে স্বল্পতার জন্য হয়ে থাকে।

কাজ : বাস্তব জীবনের সুযোগ ব্যয় সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ উল্লেখ কর।

২.৪ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

আয় : উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরী বলে।

সঞ্চয় : মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়

ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের উপর।

বিনিয়োগ : মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরো, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

কাজ : বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে এ রকম ৪টি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।

২.৫ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বৈচিত্র্য থাকার জন্য মানুষ নানাবিধ কাজ করে। এসব কাজের মূল লক্ষ্য হলো জীবিকা সংগ্রহ করা। জীবিকার জন্য কেউ কল-কারখানায়, কেউ অফিস বা কেউ জমিতে কাজ করে। জীবিকা সংগ্রহ ছাড়াও মানুষ খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন বা সন্তান প্রতিপালনের মতো কাজও করে। আবার অনেকে সমাজ বিরোধী কাজের সাথেও জড়িত থাকে। উপরের সবগুলো কাজকে আমরা অর্থনৈতিক কাজ বলব না। উপরের এ কার্যাবলি আমরা দুভাবে ভাগ করি। যেমন-
ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি, খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবন ধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন- শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে- এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা।

খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

যে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন- পিতামাতার সন্তান লালন-পালন, শেখের বশে খেলাধুলা করা ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ। এ ছাড়া যে সমস্ত কাজে সমাজে বিরূপ ফল বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সমস্ত কাজ অর্থনৈতিক কাজ নয়। যেমন- সমাজ বিরোধী কাজ।

২.৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। তবে সাম্প্রতিককালে শিল্প খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে।

কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি : বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত। এ দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৫০% ভাগ শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। জমিচাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশু পালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ : কৃষিকাজ ছাড়াও এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো- পোষাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড় বড় শিল্প ও কল-কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকুরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ। এ ছাড়া খেলনা, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালার কাজ করে এ দেশের অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেকে গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজি, ঝাড়কুঁক, বন্য প্রাণীর খেলা দেখানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের। অতি প্রাচীন কাল থেকে বিচিত্র এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ সুখ-স্বচ্ছন্দ্য থাকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কাজ : বাংলাদেশের মানুষের কৃষি সংক্রান্ত এবং কৃষি বহির্ভূত ১০টি করে অর্থনৈতিক কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও।
৩. সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন ব্যাখ্যা কর।
৪. বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
২. সম্পদের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
৩. দ্রব্য কী?

৪. দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর ।
৫. সুযোগ ব্যয় কী?
৬. আয়ের সংজ্ঞা দাও ।
৭. সঞ্চয় কী?
৮. বিনিয়োগ বলতে কী বোঝায়?
৯. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী?
১০. অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি সমষ্টিগত সম্পদ?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. ঘরবাড়ি | খ. ডাকঘর |
| গ. পদ্মা নদী | ঘ. বঙ্গোপসাগর |

২. ব্যবসায়ের সুনাম সম্পদ । কারণ এর-

- i. অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে
- ii. স্বত্ব পরিবর্তন করা যায়
- iii. সামষ্টিক মালিকানা দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাহেলার একটি সেলাই মেশিন আছে । এর থেকে তাঁর মাসিক আয় ১০,০০০/- টাকা । তিনি পারিবারিক ভরণ পোষণ, সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় পত্রে জমা করেন । সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরেকটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন ।

৩. রাহেলার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. সঞ্চয় | খ. মূলধন |
| গ. বিনিয়োগ | ঘ. সুযোগ ব্যয় |

৪. রাহেলার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে-

- i. পারিবারিক নিরাপত্তা বাড়বে
- ii. সন্তানের প্রতি দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে
- iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শফিকদের বাড়িতে কয়েকজন মেহমান এসেছেন। তার মা তাকে ১০০০/- টাকা দিয়ে কিছু মাছ ও মাংস কিনতে বাজারে পাঠান। সে বাজারে গিয়ে দেখে পুরো টাকা দিয়ে ২ কেজি মাছ অথবা ৪ কেজি মাংস কিনতে পারে। অনেক চিন্তার পর সে ১ কেজি মাছ এবং ২ কেজি মাংস ক্রয় করে।

ক. আয় কী?

খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

গ. শফিকের মাছ-মাংস ক্রয়ের ধারণাটি চিত্রে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শফিকের দুটি দ্রব্য নির্বাচনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. হাফিজ তাঁর কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মানুষকে সংগঠিত করার দক্ষতা তার অপরিণীম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের জন্য সদর ঘাটে তার একটি ঘর আছে। এখান থেকে তাঁর কর্মচারীরা তাঁর কথামতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন।

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে?

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

গ. হাফিজের সদরঘাটের ঘরটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাফিজের গুণাবলি কী সম্পদ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য

Utility, Demand, Supply and Equilibrium

এ অধ্যায়ে উপযোগ, ভোগ, মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি, চাহিদা, বাজার চাহিদা রেখা ও ভারসাম্য দাম নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা-

- উপযোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব
- মোট উপযোগ যে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি তা প্রমাণ করতে পারব
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারব
- দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- দাম ও যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করতে পারব

৩.১ উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তা

উপযোগ : আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। খাবার সামগ্রী, পরিধানের সামগ্রীসহ অনেক কিছুই প্রয়োজন হয়। এগুলো না থাকলে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারিনা। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বইপত্র, ডাক্তারের সেবা প্রভৃতি দ্রব্য মানুষের অভাব মেটায়। অতএব, অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। উপযোগ একটি মানসিক ধারণা।

ভোগ : প্রতিদিন আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার করি বা এগুলো আমরা ভোগ করি। এখানে ভোগ বলতে কিছু এগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না। কেননা আমরা কোনো জিনিস ধ্বংস বা নিঃশেষ করতে পারিনা। আমরা শুধু দ্রব্যগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে এর উপযোগ গ্রহণ করতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা হবে না। অতএব অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

ভোক্তা : যে ব্যক্তি ভোগ করে তাকে আমরা ভোক্তা বলি। অর্থাৎ কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলা হয়।

কাজ : উপযোগ ও ভোগের মধ্যে ২টি পার্থক্য উল্লেখ কর।

৩.২ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

মোট উপযোগ

বাজারে গিয়ে তুমি খাওয়ার জন্য একাধিক আম কিনতে চাও। ১ম আমটি কিনতে তুমি যে টাকা ব্যয় কর ২য়, ৩য় বা ৪র্থ বার আম ক্রয় করতে তা কর না। কারণ ১ম আমটি ভোগ করার পর তোমার আম খাওয়ার ইচ্ছা অনেকটা পূরণ হয়ে যায়। ২য় বার আমের প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ কমে যায়। ৩য়, ৪র্থ আমের ক্ষেত্রে আগ্রহ আরও কমবে। এমন হতে পারে যে, তুমি আর আম কিনবে না। কারণ আম খাওয়ার প্রতি সে সময়ে তোমার আর কোনো আগ্রহ থাকে না বা তোমার কাছে অতিরিক্ত আমের উপযোগ শূন্য। আম ক্রয় করতে তোমাকে টাকা ব্যয় করতে হয়। ধরি, ১ম আমটি তুমি কিনলে ৫ টাকায়, ২য় আমটি কিনতে তুমি ৪ টাকা দিতে রাজি থাকো, ৩য় আমের জন্য ৩ টাকা দিতে চাও এবং ৪র্থ আমের জন্য ২ টাকা। এভাবে $(৫ + ৪ + ৩ + ২) = ১৪$ টাকা দিয়ে তুমি ৪টি আম কিনলে। টাকাকে উপযোগের মাপকাঠি ধরলে এখানে ৪টি আমের মোট উপযোগ ১৪। অতএব, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। যেহেতু অতিরিক্ত আম থেকে ক্রমান্বয়ে কম তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেহেতু ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহাসমান হারে বাড়ে।

প্রান্তিক উপযোগ :

মনে কর তুমি ৩টি আম কিনেছ। এখন তুমি আবার আরেকটি আম কিনলে। এই অতিরিক্ত ৪র্থ আমটি হলো প্রান্তিক আম। এই প্রান্তিক আম থেকে তুমি যে তৃপ্তি বা উপযোগ পেলো তাই প্রান্তিক উপযোগ। এই আম কিনতে তুমি ২ টাকা ব্যয় করলে প্রান্তিক উপযোগ হবে ২। অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

সূচির মাধ্যমে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের উপস্থাপন

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৫	৫.০০
২য়	$৫ + ৩ = ৮$	৮.০০
৩য়	$৮ + ৩ = ১১$	৩.০০
৪র্থ	$১১ + ২ = ১৩$	২.০০
৫ম	$১৩ + ১ = ১৪$	১.০০
৬ষ্ঠ	$১৪ + ০ = ১৪$	০.০০
৭ম	$১৪ - ১ = ১৩$	-১.০০

উপরের সূচিতে দেখা যায় ১ম আমের দাম যখন ৮ টাকা প্রান্তিক উপযোগ তখন ৮ টাকা। ২য় আম কেনায় ১ম ও ২য় আমের ব্যয় ১৫ টাকা। দুটি আম থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৫। ২য় আম থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৭। এভাবে ৪টি আম থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ২৬। ৪র্থ আমের প্রান্তিক উপযোগ ৫। এভাবে প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ০ ও -১ টাকা। ৭ম আমটির তোমার কাছে কোনো উপযোগ না থাকায় তুমি তা কিনবে না।

কাজ : মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের চারটি পার্থক্য লিখ।

৩.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

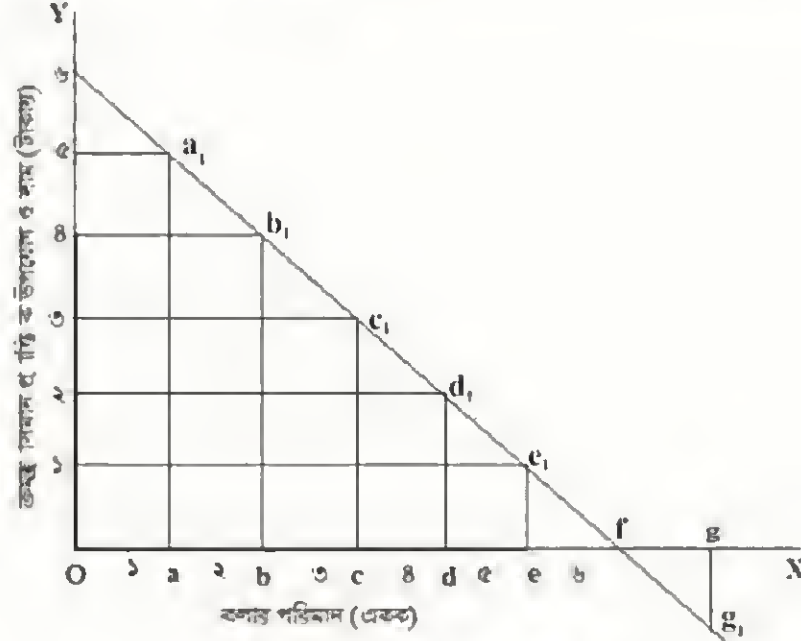
উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে তুমি বার বার একই পরিমাণ আম খেলে আমের প্রতি তোমার আশ্রয় কমতে থাকে এবং উপযোগও কমে। উপযোগ কমে বলেই তুমি অতিরিক্ত একক আমের জন্য কম দাম দিতে চাও। ৬ষ্ঠ আমের জন্য প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (Zero) এবং ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (Negative)। অর্থাৎ একই জিনিস বার বার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। সুতরাং ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের একক বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাবার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কিছু শর্ত মেনে চলে। তা হলো ক) ভোক্তা হবে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন; খ) ভোক্তা চাইলে দ্রব্যের উপযোগ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারে; গ) দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে; ঘ) দ্রব্যটি ভোগ করার সময় ভোক্তার আয়, বুচি এবং পছন্দের পরিবর্তন হবে না। ঙ) নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য।

রেখাচিত্রের সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়। চিত্রে ভূমি অক্ষে আমের পরিমাপ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ ও দাম পরিমাপ করা হয়েছে।

চিত্র :



ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে আমের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ ও দাম নির্দেশ করা হয়। চিত্রে ভূমি ১ম আম থেকে aa_1 পরিমাণ উপযোগ তথা প্রান্তিক উপযোগ লাভ কর এবং ১ম আমের জন্য ৫ টাকা দাম দাও। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম আম থেকে ভূমি যথাক্রমে bb_1 , cc_1 , dd_1 এবং ee_1 পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ কর। অর্থাৎ ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ভূমি ২য় আমের জন্য ৪ টাকা, ৩য় আমের জন্য ৩ টাকা, ৪র্থ আমের জন্য ২ টাকা, ৫ম আমের জন্য ১ টাকা দিতে রাজি থাকা। ৬ষ্ঠ আমের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য এবং ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ -১.০০ টাকা। ভূমি অক্ষ রেখার f বিন্দু শূন্য প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করে। ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (-১ টাকা) বিধায় gg_1 তা নির্দেশ করে। এখানে $ee_1 < dd_1 < cc_1 < bb_1 < aa_1$ । এ থেকে বুঝা যায় আমের জন্য ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ভোক্তার কাছে অতিরিক্ত এককগুলোর উপযোগ ক্রমেই কমে যায়। এবার a_1 , b_1 , c_1 , d_1 , e_1 , f এবং g_1 বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উপযোগ বা MU (Marginal Utility) রেখা পাওয়া যায়। রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী। এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। সে কারণেই প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি নিম্নগামী।

৩.৪ চাহিদা :

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই। গাড়ি, সুন্দর বাড়ি, উন্নত খাবার ইত্যাদি। আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চাহিদা নয়। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন- ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, ২. ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য, এবং ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা। সুতরাং ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা (Demand) বলে।

চাহিদা বিধি : তোমার মা তোমার বাবাকে বাজার থেকে ইলিশ মাছ আনতে বললেন। বাজার থেকে এসে তোমার বাবা বিরক্তির সাথে বললেন, ইলিশ মাছের দাম বেশি তাই কেনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় তোমার বাবার কাছে ইলিশ মাছের চাহিদা নেই বা কমে গেছে। আবার একদিন তোমার বাবা হঠাৎ দুটি ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ি এলেন এবং হাসিমুখে বললেন আজকে ইলিশ মাছের দাম কম তাই দুটো মাছ নিয়ে এলাম। অর্থাৎ চাহিদার সাথে দামের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

অতএব চাহিদা বিধি বা সূত্র বলতে আমরা বুঝি “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে।” [দাম (\uparrow) - চাহিদা (\downarrow) আবার দাম (\downarrow) - চাহিদা (\uparrow)]। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, ক্রেতার বুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি।

চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন

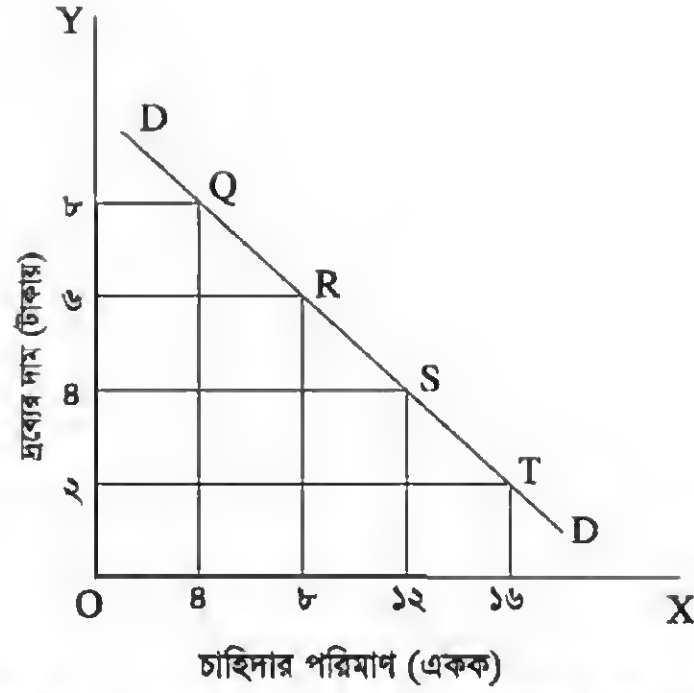
চাহিদা বিধিতে আমরা দেখেছি দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে আবার দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। এ ধারণাটি যখন সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে চাহিদা সূচি বলে। অতএব, বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয় তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা সূচি বা চাহিদা তালিকা বলে।

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৮.০০	৪
৬.০০	৮
৪.০০	১২
২.০০	১৬

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ৮ টাকা হলে একজন ভোক্তা ৪ একক দ্রব্য ক্রয় করে। দাম কমে ৬ টাকা, ৪ টাকা ও ২ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে ৮ একক, ১২ একক ও ১৬ একক হয়। চাহিদা সূচির মাধ্যমে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

উপরের এ চাহিদা সূচি থেকে আমরা চাহিদা রেখা অংকন করতে পারি।

চাহিদা রেখা



উপরের রেখাটিতে ভূমি অক্ষে বা OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে বা OY অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪ একক। ৮ টাকা দাম ও ৪ একক পরিমাণ থেকে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর Q বিন্দুতে মিলিত হয়। এভাবে R, S ও T বিন্দুতে যথাক্রমে ৬ টাকায় ৮ একক, ৪ টাকায় ১২ একক এবং ২ টাকায় ১৬ একক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার Q, R, S ও T বিন্দুগুলোকে যোগ করলে আমরা পাবো DD রেখা। এই DD রেখাই চাহিদা রেখা। DD চাহিদা রেখার বিন্দুগুলো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করছে।

এভাবে আমরা চাহিদা বিধি অনুযায়ী চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারি। উল্লেখ্য, আমরা এখানে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করেছি।

কাজ : চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ কর।

৩.৫ বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন

একজন ব্যক্তির চাহিদা সূচি থেকে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়। তেমনি বাজার চাহিদা রেখাও অঙ্কন করা সম্ভব। বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা। আমরা বোঝার সুবিধার্থে ধরে নেব একটি বাজারে ভোক্তার সংখ্যা হলো দুজন। নিচে দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখার মাধ্যমে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো:

বাজার চাহিদা সূচি

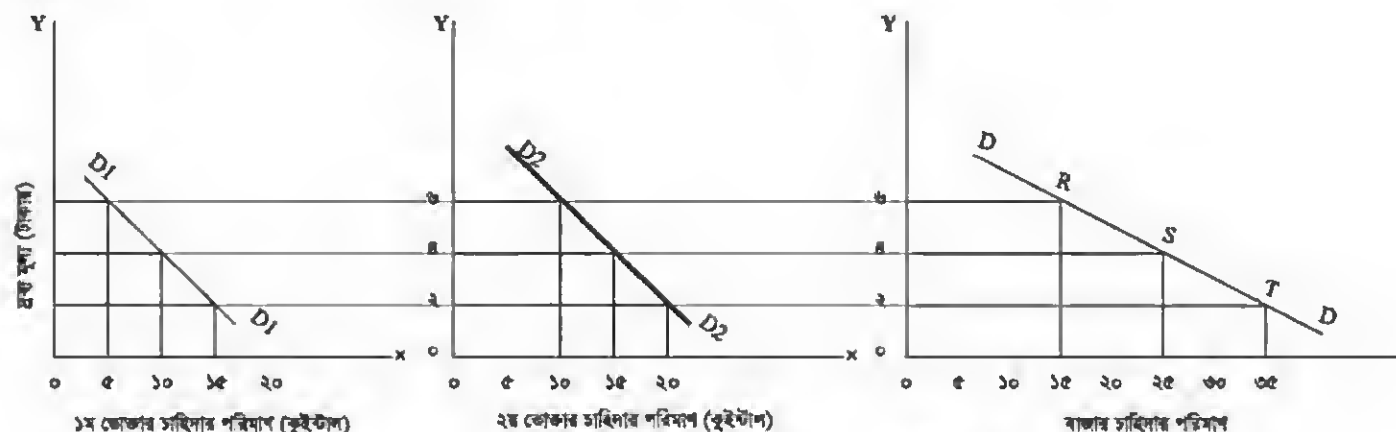
দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা (Q_1) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	২নং ভোক্তার চাহিদা (Q_2) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	বাজার চাহিদা (Q) ($Q=Q_1+Q_2$) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)
৬.০০	৫	১০	১৫
৪.০০	১০	১৫	২৫
২.০০	১৫	২০	৩৫

উপরের সূচিতে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদা দেখানো হয়েছে। এ দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে কীভাবে বাজার চাহিদা সূচি তৈরি করা হয়েছে তা দেখানো হলো।

বাজারে কোনো দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ব্যক্তি যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত থাকে তা যে চাহিদা রেখায় সাহায্যে দেখানো হয় তাকে বলা হয় বাজার চাহিদা রেখা।

১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদা রেখা পাশাপাশি যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা অংকন করা যায়।

চিত্র:



১ম, ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা রেখা

উপরের রেখাচিত্রে বাজারের ১ম ও ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা হলো যথাক্রমে D_1 , D_2 ও D_1 ও D_2 । দ্রব্যের দাম যখন ৬ টাকা তখন ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কুইন্টাল ও ১০ কুইন্টাল এবং বাজার চাহিদা হবে (৫ কুইন্টাল + ১০ কুইন্টাল) বা ১৫ কুইন্টাল। যা বাজার চাহিদা রেখায় R বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। দাম কমে ৮ টাকা ও ২ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা যথাক্রমে (১০ কুইন্টাল + ১৫ কুইন্টাল) বা ২৫ কুইন্টাল এবং (১৫ কুইন্টাল + ২০ কুইন্টাল) বা ৩৫ কুইন্টাল যা বাজার চাহিদা রেখায় S ও T বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এবার আমরা R, S ও T বিন্দু যোগ করে DD চাহিদা রেখা অংকন করি। এটি বাজার চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত।

৩.৬ যোগান

বাজারে গেলে আমরা দেখব বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে বিক্রেতাগণ দোকান সাজিয়ে রেখেছেন। তবে আমরা এটাকেই যোগান বা সরবরাহ বলব না। অর্থনীতিতে যোগান বলতে একজন বিক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক ও সমর্থ থাকে তাকে যোগান বলে।
উল্লেখ্য- একটি দ্রব্য, একটি নির্দিষ্ট সময় ও একটি নির্দিষ্ট দাম এখানে বিবেচ্য। অতএব, বিক্রেতা বিভিন্ন দামে দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকেই অর্থনীতিতে যোগান (Supply) বলে।

যোগান বিধি

আমরা প্রতিনিয়ত বাজারে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। একজন বিক্রেতা কখন তার দ্রব্যটি বিক্রয় করতে আগ্রহী হবেন? অবশ্যই ঐ দ্রব্যের দাম যখন বাজারে সবচেয়ে বেশি তখনই একজন বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রয় করতে চাইবেন। ধরো, আলুর কেজি যখন ১৫ টাকা তখন বিক্রেতা ২ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করে। দাম বেড়ে ২০ টাকা

কেজি হলে বিক্রয়তা বেশি পরিমাণে আলু সরবরাহ করতে চায়। মনে করি, তখন সরবরাহ হবে ৩০ কুইন্টাল। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমার সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ কমে যায়। অতএব দাম ও যোগানের সম্পর্ক সম্মুখী। দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয় যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (যেমন, উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত), দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অংকন

দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের এ সম্মুখী পরিবর্তনকে যোগান সূচিতে দেখানো যায়।

যোগান সূচির একদিকে দ্রব্যের দাম এবং অন্যদিকে দ্রব্যের যোগান গাণিতিকভাবে দেখানো হলো।

যোগান সূচি

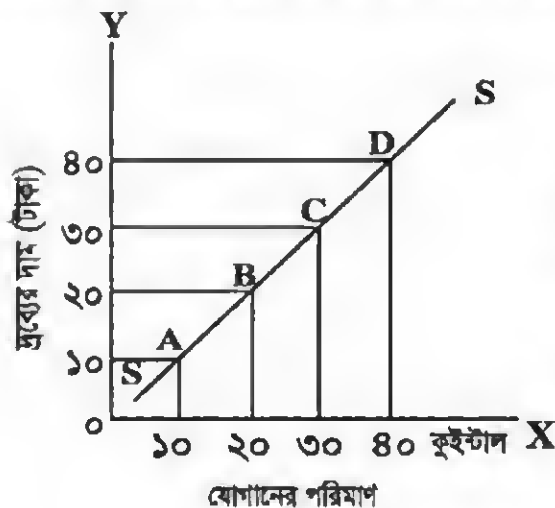
প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
১০.০০	১০
২০.০০	২০
৩০.০০	৩০
৪০.০০	৪০

সূচিতে দেখা যায় কোনো দ্রব্যের প্রতি কুইন্টালের দাম ১০ টাকা হলে তার যোগান হয় ১০ কুইন্টাল। দাম বেড়ে ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল ও ৪০ কুইন্টাল। এভাবে যোগান সূচিতে যোগান বিধি প্রতিফলিত হয়।

যোগান রেখা

কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের এ সম্মুখী পরিবর্তনকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে।

যোগান সূচি থেকে কীভাবে যোগান রেখা অংকন করা যায় তা নিচে দেখানো হলো।



চিত্রে OX বা ভূমি অক্ষে দ্রব্যের যোগান বা পরিমাণ ও OY বা লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হলো। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল। যা মিলিত হয়েছে A বিন্দুতে। এভাবে দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা তখন দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল এবং ৪০ কুইন্টাল। বিন্দুগুলো মিলিত হয়েছে যথাক্রমে B, C এবং D বিন্দুতে। এবার আমরা A, B, C ও D বিন্দুগুলোকে যোগ করলে পাবো SS রেখা। এটিই যোগান রেখা।

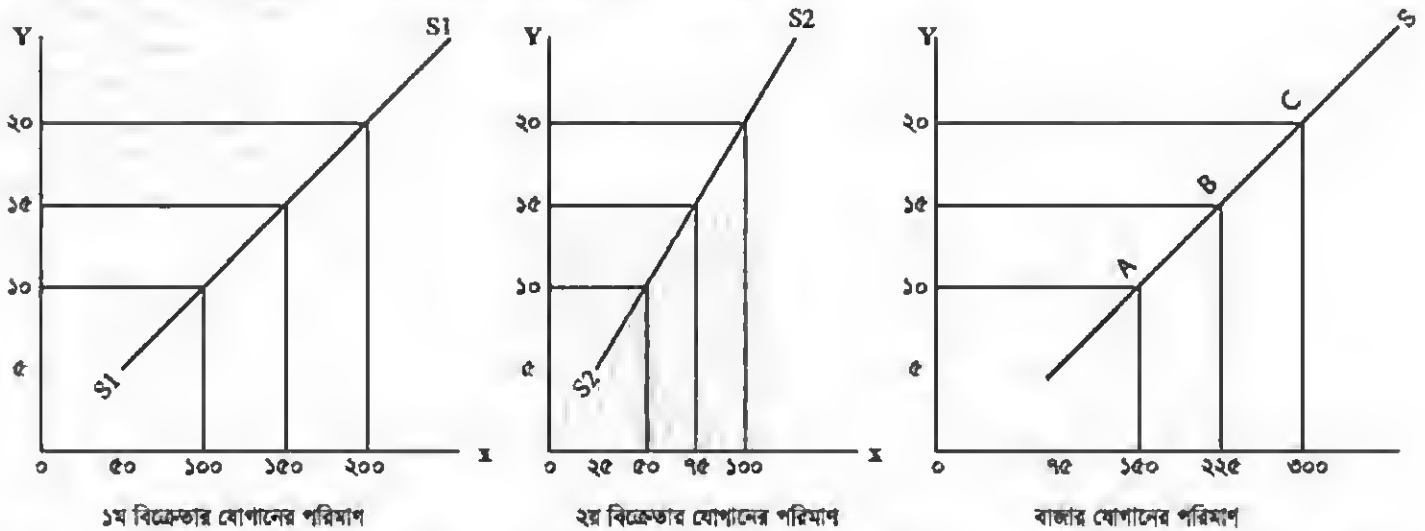
৩.৭ বাজার যোগান রেখা অংকন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেন তাকে ব্যক্তিগত যোগান বলে। অন্যদিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বাজারের সব বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেন তাকে বাজার যোগান বলে। সব বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগানসূচি যোগ করে বাজার যোগান সূচি তৈরি করা যায়। নিচে একটি সংক্ষিপ্ত ও সরলীকৃত বাজার যোগান সূচি দেখানো হলো-

বাজার যোগান সূচি

দ্রব্যের দাম (টাকা)	১ম বিক্রেতার যোগান (S_1) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	২য় বিক্রেতার যোগান (S_2) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	বাজার যোগান (S) $S=S_1+S_2$ দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)
১০.০০	১০০	৫০	১৫০
১৫.০০	১৫০	৭৫	২২৫
২০.০০	২০০	১০০	৩০০

উপরের টেবিলে ১ম ও ২য় বিক্রেতার দ্রব্যের যোগান দেখানো হয়েছে। এ দুজন বিক্রেতার যোগানকৃত দ্রব্য দিয়ে কীভাবে বাজারে যোগান রেখা অংকন করা যায় তা দেখানো হলো-

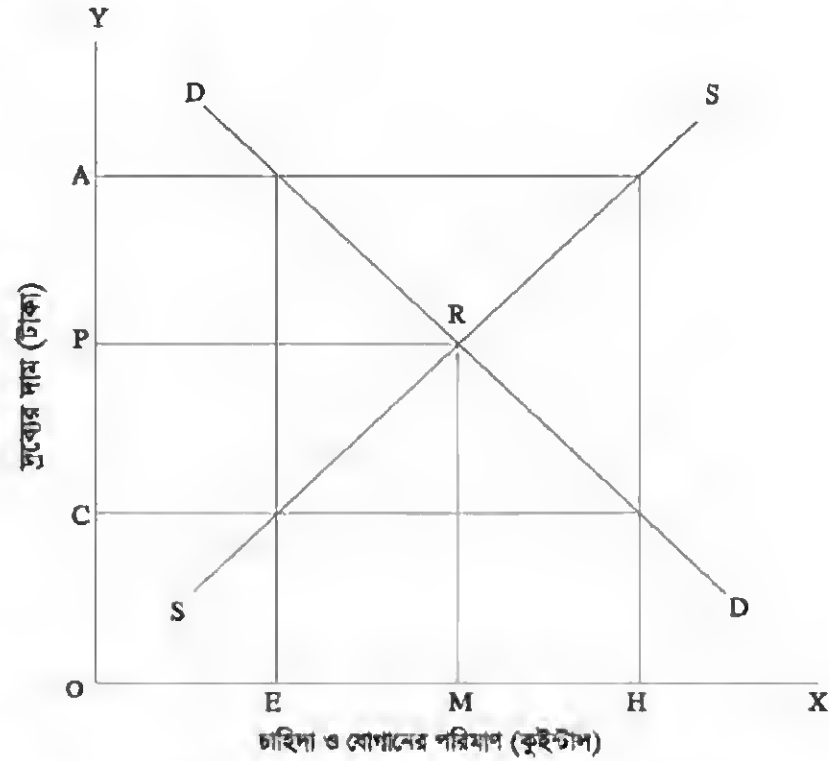


উপরের রেখা চিত্রে ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান রেখা হলো যথাক্রমে S_1S_1 ও S_2S_2 । দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন ১ম ও ২য় বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ কুইন্টাল এবং বাজার যোগান হবে $(100+50) = 150$ কুইন্টাল। যা চিত্রে A বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম বেড়ে ১৫ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১৫০ ও ৭৫ কুইন্টাল এবং বাজার যোগান $(150+75) = 225$ কুইন্টাল। যা চিত্রে B বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম আরও বেড়ে ২০ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ কুইন্টাল। মোট যোগানের পরিমাণ হবে $(200+100) = 300$ কুইন্টাল। যা চিত্রে C বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এবার A, B এবং C বিন্দু যোগ করে আমরা SS রেখা অংকন করি। যা বাজার যোগান রেখা হিসেবে পরিচিত।

কাজ : যোগান সূচি ও যোগান রেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ কর।

৩.৮ ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

বাজারের একটি সাধারণ দৃশ্য হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে দর কষাকষি করা। ক্রেতা চেষ্টি করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে। আবার, বিক্রেতা চেষ্টি করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে। ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয় যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।



উপরের রেখা চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। রেখাচিত্রে বাজার চাহিদা রেখা DD এবং বাজার যোগান রেখা SS অঙ্কন করা হয়েছে।

ধরো, OA দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে OE ও OH। এ দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের পরিমাণ বেশি। চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হলে দামের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি হবে। ফলে দাম কমে OA থেকে OP তে আসবে। যেখানে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। আবার দাম যদি OC হয় তাহলে যোগানের পরিমাণ OE এবং চাহিদার পরিমাণ OH। অর্থাৎ এখানে যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশি ফলে দ্রব্যের দাম অবশ্যই বাড়বে এবং দাম OP তে গিয়ে স্থির হবে। যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান। এভাবে দেখা যায় দাম যখন OP হয় কেবল তখনই চাহিদা ও যোগানের মোট পরিমাণ সমান অর্থাৎ OM। অতএব OP দামে চাহিদা ও যোগান সমান থাকে এবং দাম বাড়া কিংবা কমানোর কোনো প্রবণতা থাকে না। কাজেই OP হলো ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো OM। R বিন্দুতে DD এবং SS পরস্পরকে ছেদ করে। R ছেদ বিন্দুতে নির্দেশিত হলো ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ।

কাজ: পোস্টার কাগজে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের চিত্রটি শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উপযোগ কী?
২. ভোগ ও ভোক্তা বলতে কী বোঝায়?
৩. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বোঝায়?
৪. চাহিদার সংজ্ঞা দাও। চাহিদার বিধিটি কী?
৫. বাজার চাহিদা রেখা কী?
৬. যোগান বিধিটি কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ক্রমব্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর।
২. একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচী থেকে চাহিদা রেখা অংকন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।
৩. দুইজন ভোক্তার কাল্পনিক চাহিদা সূচী থেকে একটি বাজার চাহিদা রেখা অংকন কর।
৪. একটি কাল্পনিক যোগান সূচী থেকে যোগান রেখা অংকন কর।
৫. চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দান নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে চাহিদার শর্ত কয়টি?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২. বাজার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নিচের কোন শর্তটি আবশ্যিক?

ক. যে বিন্দুতে চাহিদা = যোগান

খ. যে বিন্দুতে চাহিদা > যোগান

গ. যে বিন্দুতে যোগান > চাহিদা

ঘ. যোগান দাম < চাহিদা দাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাহসীন স্কুলে গিয়ে পেয়ারা কিনে খেল। তার ভোগকৃত পেয়ারার উপযোগ সূচি নিচে দেওয়া হলো-

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১	৫	৫
২	৯	৪
৩	১২	<input type="text"/>

৩. তাহসীনের ৩য় পেয়ারার প্রান্তিক উপযোগ কত?

ক. ৫ টাকা খ. ৪ টাকা

গ. ৩ টাকা ঘ. ২ টাকা

৪. তাহসীনের উক্ত আচরণে-

i. স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে

ii. পেয়ারার প্রতি আকর্ষণ অপরিবর্তিত রয়েছে

iii. পেয়ারার প্রতি প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ক ও খ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'X' দ্রব্যের চাহিদা সূচী দেওয়া হলো-

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	ক ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল)	খ ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল)
২০ টাকা	৫	৭
১৫ টাকা	১০	১১
১০ টাকা	১৫	১৫

ক. উপযোগ কাকে বলে?

খ. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

গ. 'X' দ্রব্যের চাহিদা সূচি থেকে 'ক' ব্যক্তির চাহিদা রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'X' দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা অংকন করে ক ব্যক্তির চাহিদা রেখার সাথে তুলনা কর।

২. সুজন বাজারে গিয়ে দেখে আলুর দাম প্রতি কেজি ২৫ টাকা। সে ১২০ কেজি আলু কিনে, কিন্তু করিম একই দামে ১৬০ কেজি আলু বিক্রি করতে চায়। পরদিন আলুর দাম কমে ২০ টাকা হওয়াতে সুজন ১৪০ কেজি আলু কেনে এবং করিম ১৪০ কেজি আলু বিক্রি করে।

ক. চাহিদা কাকে বলে?

খ. চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. করিমের আলুর যোগান রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কী মনে কর সুজন ও করিম আলুর বাজারে ভারসাম্য দামে পৌঁছাতে পেরেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায় উৎপাদন ও সংগঠন Production & Organisation

শরবত একটি উৎপাদিত দ্রব্য। শরবত তৈরি করতে পানি, চিনি, লেবু ইত্যাদির প্রয়োজন। উপকরণ ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন বা উপযোগ বা তৃপ্তি সৃষ্টি করা যায়। আর এ কাজটি করে থাকে সংগঠন। উৎপাদন করতে উপকরণ যেমন পানি, চিনি, লেবু লাগে, কিভাবে উৎপাদন করবে তার একটি পরিকল্পনা করতে হয়, উৎপাদন করার সময় বিভিন্ন জন বিভিন্ন কাজ করেন- যোগ্যতা অনুযায়ী এই কাজগুলো বণ্টন করতে হয়, উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজারে নিতে হয়। এ ধরনের কাজগুলো করে সংগঠন। সংগঠন দক্ষ না হলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না।



এই অধ্যায়ের পাঠশেষে আমরা-

- উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- উৎপাদনের সাথে উৎপাদকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- উৎপাদনের উপকরণসমূহ বর্ণনা করতে পারব
- সংগঠন ও এর বিকাশ আলোচনা করতে পারব
- গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারব
- প্রকাশ্য ব্যয় ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় চিহ্নিত করতে পারব
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হব
- ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারব

৪.১ উৎপাদন ও উৎপাদক (Production and Producer)

উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। আবার উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন-আটা, লবণ, পানি, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। রুটি একটি উৎপাদিত নতুন দ্রব্য। রুটি খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি বা তৃপ্তি পাই। অর্থাৎ রুটি তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা টাকা বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে রুটি পেতে পারি। অর্থাৎ নতুন দ্রব্য রুটির বিনিময় মূল্য আছে। ব্যবসা করার জন্য রুটি বানানো হলে অনেক সময় রুটিগুলো বাজারে নিয়ে যেতে হয়। উপকরণ সংগ্রহ থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজ তদারকি করে সংগঠন। যেমন কী উপকরণ লাগবে, কোথা থেকে উপকরণ আনবে, কে আনবে, কে লবণ, আটা, পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করবে, কে রুটি বেলবে, কে সেকবে, কে বাজারে নিবে, কত দামে বিক্রয় করবে, এই সবই দেখে সংগঠন। সব কিছু সংগঠন দক্ষতার সংগে তদারকি না করতে পারলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে না। একই ব্যক্তি সংগঠক এবং উৎপাদক হতে পারে।

উৎপাদন বা উপযোগ সৃষ্টি পাঁচ ভাগে দেখানো যায়। যেমন-

১. **রূপগত উৎপাদন** : দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উৎপাদন বলে। যেমন, কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হলো রূপগত উৎপাদন।
২. **স্থানগত উৎপাদন** : কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন, বনের কাঠ সাধারণত বনের আশেপাশের লোকজন ঝড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। শহরে আনলে মানুষ এই কাঠ দিয়ে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বানাতে পারে- ফলে এর উপযোগ বাড়ে। আবার বনে ফুলের তেমন কদর নেই। কিন্তু সেই ফুলসহ গাছ শহরের বাড়ির আড়িনায় রাখলে এর কদর বাড়ে অর্থাৎ উপযোগ বাড়ে।
৩. **সময়গত উৎপাদন** : সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন ও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উৎপাদন বলে। যেমন, পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়।
৪. **সেবাগত উৎপাদন** : মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উৎপাদন সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উৎপাদন বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখে বা বৃদ্ধি করে।
৫. **মালিকানাগত উৎপাদন** : কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উৎপাদন সৃষ্টি করা যায়। যেমন, অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে ভালোভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারে।

উপরে তোমরা উৎপাদনের ধারণা পেলে। এবার তোমরা জানতে পারবে এই উৎপাদনের কাজটি কে বা কারা করে। রমজান আলী একজন কৃষক। তাঁর ৩ বিঘা কৃষিজমি রয়েছে। এই জমিতে রমজান এক ঋতুতে ধান উৎপাদন করেন, অন্য ঋতুতে গম উৎপাদন করেন। ধান ও গম উৎপাদনের মাঝখানে সবজি চাষ করেন। সব উৎপাদনের জন্য উপকরণ হিসাবে বীজ, সার, পানি, কীটনাশক, ধান-গম কাটা ও মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

কাজ : (১) নিচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উৎপাদনের প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস কর ।

(ক) মাছের পুকুর, (খ) সৈনিকের কাজ, (গ) পিতামাতার আদর স্নেহ, (ঘ) বাবার সম্পত্তি সন্তানকে প্রদান (ঙ) লোহা পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি, (চ) গম থেকে আটা, (ছ) আখ থেকে চিনি, (জ) ধান থেকে চাল, চাল থেকে পিঠা, (ঝ) গ্রামের কলা, ফলমূল, সবজি শহরে স্থানান্তর, (ঞ) অগ্রহায়ণ মাসের আলু আষাঢ় মাসে বিক্রি ইত্যাদি ।

কাজ : (২) রমজান আলীকে একজন উৎপাদক না সংগঠক বলবে তা উল্লেখ কর ।

৪.২ উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production)

মনে কর তোমার এলাকায় গম, আলু, কলা, ধান, ইত্যাদি কৃষিপণ্য এবং কাপড়, বিস্কিট, প্লাস্টিক ইত্যাদি শিল্পপণ্য উৎপাদন হয় । এই কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে অনেকগুলো উপকরণের প্রয়োজন হয় । কৃষকের ধান উৎপাদন করতে জমি, বীজ, সার, লাঙ্গল, সেচ, শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হয় । আবার শিল্পপণ্যের জন্য কারখানা, বিদ্যুৎ, কাপড়, সুতা, মেশিন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ময়দা, চিনি, তৈল, শ্রমিক লাগে । এসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে আবার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, আলো-বাতাস, পরিবেশ, খনিজ দ্রব্য, সূর্য কিরণ, পানি, আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় । এখানে যেসব দ্রব্যের কথা বলা হলো এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ । অতএব কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে ।

উৎপাদনের উপকরণ মূলত চার ধরনের হয় । যেমন, ১. ভূমি (Land), ২. শ্রম (Labour), ৩. মূলধন (Capital), এবং ৪. সংগঠন (Organisation)

১. **ভূমি :** উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে । যেমন, জমি, মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্য কিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত ।
২. **শ্রম :** উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে । উৎপাদনে চাষী, জেলে, কামার, কুমার, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের কার্যিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে । আবার অফিস আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয় । একইভাবে শিক্ষকের শিক্ষাদান, ডাক্তারের সেবা ও উকিলের পরামর্শ এক ধরনের শ্রম ।
৩. **মূলধন :** মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ । এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে । যেমন-যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি ।
৪. **সংগঠন :** সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলে । উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে । সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ পরিচালনাকে ব্যবস্থাপনাও বলা হয় । এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে । তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন, কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম, মূলধন, একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা এসবই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ।

সুতরাং সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব একরকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি। আবার উন্নত শিল্প প্রধান দেশ যেমন-যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি।

কাজ : (১) দেশের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপকরণসমূহ কী কী হতে পারে?

দেশের নাম উৎপাদনে ব্যবহৃত	গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ
জাপান শিল্পনির্ভর দেশ

কাজ : (২) উৎপাদন খাতে অধিক গুরুত্ব অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজাও।

উৎপাদন খাত	অধিক গুরুত্বের ভিত্তিতে উপকরণগুলো হচ্ছে
কৃষি
শিল্প

৪.৩ সংগঠন ও এর বিকাশ (Organisation and Its Development)

আয়েশা বেগম তাঁর সংসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে বাড়িতে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। এই খামার থেকে সারা বছরই কমবেশি ডিম উৎপাদন হয়। এক বছর পর সরকারি মাছের খামার দেখতে যান আয়েশা এবং এর পর থেকে তাঁর মাথায় হাঁস-মুরগির খামারের পাশাপাশি মাছ চাষ করার আগ্রহ জাগে। এক বছরে হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রির নিট আয় বিশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে পুকুর করে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ শুরু করেন। দুটি খামারে নতুন করে কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ পায়। হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রি এবং এক বছর পরে পুকুরের মাছ বিক্রি শুরু হলে আয়েশার উপার্জন বাড়তে থাকে। তিনজন সন্তানের পড়াশোনার খরচ এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় খরচ মিটিয়ে আয়েশার সঞ্চয়ও বাড়তে থাকে। আয়েশার কাজকর্ম বাড়ায় তাঁর স্বামী রহমত আলী শহরের চাকুরি ত্যাগ করে গ্রামে ক্রীর খামারে যোগ দেন। উভয়ের প্রচেষ্টায় তাঁরা বেশ কিছু জমি, হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। ১২ জন নারী-পুরুষ শ্রমিকও নিয়োগ করেন। প্রত্যেক শ্রমিকের কাজও বুঝিয়ে দেন তাঁরা। আয়েশা এবং রহমত পালাক্রমে শ্রমিক কর্মচারী এবং খামারসমূহ তদারক করেন। ডিম ও মাছ বাজারজাত করে বেচা-কেনার ব্যবস্থাও করেন তাঁরা। তাদের সাফল্য দেখে গ্রামের অনেকে তাঁদের অনুসরণ করে গ্রাম ও এলাকা জুড়ে হাঁস-মুরগির খামার এবং মাছ চাষ শুরু করেন। ডিম ও মাছ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকার নিয়মিত আসে আয়েশার গ্রামে। কয়েক বছরে এলাকাটি কৃষি, হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষাবাদ করে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এলাকায় এখন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগি ও মাছ উৎপাদন করা যায়।

আমরা কি বলতে পারি যে আয়েশা বেগম একজন সংগঠক? তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা কি বিকাশ লাভ করেছে?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে সংগঠন বলে। সত্যিকার অর্থে সংগঠন ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যবলি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই কার্য সম্পাদনে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন। সুতরাং সংগঠন হচ্ছে ব্যবসায়ের ভিত্তি।

সংগঠনের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে ধরে রাখা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি সাংগঠনিক কাঠামোর কাজ। তাছাড়া বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন, নিয়ম-শৃংখলা গড়ে তোলা ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্গত। ব্যবসায়ের আয়তন, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্পের প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের দক্ষতা প্রভৃতির উপর ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভরশীল।

ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও শাখার কাজকর্ম নির্দিষ্ট করে তারপ্রাপ্ত উদ্ভব ও অধস্তন কর্মীদের পদগুলো ক্রমানুসারে সাজালে তা হতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কাঠামোর যে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তাকে সংগঠনের চিত্র বলে। সংগঠন ব্যবস্থাপনা যত সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে ব্যবসায়ের সাফল্য তত বেশি হবে। সুতরাং সংগঠনই হলো ব্যবসায়ের মৌলিক ও প্রধান বিষয়।

কাজ : সাংগঠনিক কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

একটি ভালো সংগঠনের কতগুলো প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য থাকে। তা হচ্ছে-

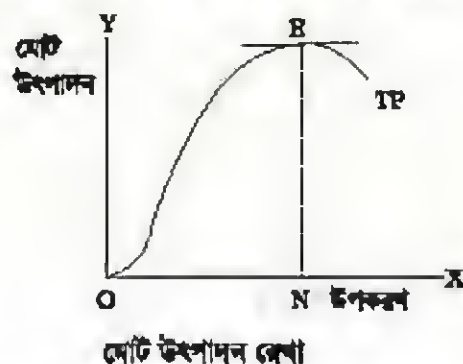
১. **ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি :** সংগঠনের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায়ের সাংগঠনিক রূপ তৈরি করতে হয়। এই উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ, কোনটি স্বল্পমেয়াদি এবং কোনটি দীর্ঘমেয়াদি তা নির্ধারণ করে নিতে হয়।
২. **ব্যবসায়ের কার্যবলি নির্ধারণ :** ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঠিকমতো নির্ধারণ করার পর ব্যবসায়ের সমগ্র কার্যবলি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি। সেজন্য প্রয়োজন হয় হিসাবরক্ষণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, পণ্য মজুদ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
৩. **কার্যবলির বিভাগ :** কার্যবলি বিশ্লেষণের পর কাজের ধরন ও উদ্দেশ্যের মিল অনুযায়ী কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একই বিভাগের সহায়ক কাজগুলোকে আবার উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি। অনেক সময় কোনো কোনো ব্যবসা আঞ্চলিক ভিত্তিতেও ভাগ করা হয়। কয়েকটি শাখা একত্রে আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে গণ্য হয়।

৪. **কর্তব্য বন্টন :** ব্যবসায়ের প্রতিটি কর্মীর উপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করা হয়। অভিজ্ঞতা, কমতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রতিটি বিভাগে ও উপবিভাগের প্রতিটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট কর্তব্য স্থির করা হয় এবং যে কর্মী যে কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ তাকে সেই কাজই দেওয়া হয়।
৫. **কর্তৃত্ব ও ভার বন্টন :** ভার অর্পণ করতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী কমতা অর্পণ করাকে বোঝায়। প্রতিটি কর্মীকে স্বাধীনভাবে, নির্বিঘ্নে এবং বধ্যবদ্ধভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হয়। উৎসাহিত কর্মকর্তা তাঁর কর্তৃত্ব বা কমতার একাংশে তাঁর অধস্তন কর্মীকে অর্পণ করেন। আবার অধস্তন কর্মী তাঁর উৎসাহিত কর্মকর্তার নিকট কাজের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন। দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সংগঠন সক্ষম হয়।

৪.৪ মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন (Total, Average and Marginal Production)

কমল বারু তাঁর এক বিঘা জমিতে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬০০ কুইন্টাল গম উৎপাদন করেন। এখানে গড়ে শ্রমিক প্রতি ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। শ্রমিক প্রতি এই ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে গড় উৎপাদন বলে। পরের মৌসুমে ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। এখানে গড় বছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৫ কুইন্টাল। এই ৬৫৫ - ৬০০ = ৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অর্থাৎ অতিরিক্ত একজন (১১তম) শ্রমিক নিয়োগ করার উৎপাদন বাড়ল ৫৫ কুইন্টাল। ১১তম শ্রমিক হলো প্রান্তিক শ্রমিক। সুতরাং প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন হলো ৫৫ কুইন্টাল। তাহলে এখানে ৬০০ কুইন্টাল হচ্ছে মোট উৎপাদন, ৬০ কুইন্টাল হচ্ছে গড় উৎপাদন এবং ৫৫ কুইন্টাল হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদন। মোট, গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনকে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো।

মোট উৎপাদন : বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে।



চিত্রে TP (Total Production) রেখা দ্বারা মোট উৎপাদন বোঝানো হয়েছে। যার একটি উপকরণ ON পরিমাণ নিয়োগ করে E বিন্দুতে সর্বোচ্চ NE পরিমাণ মোট উৎপাদন হয়।

গড় উৎপাদন : মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়। (এখানে আমরা উপকরণ হিসেবে শ্রমিক নিয়েছি। অন্য উপকরণ নিয়েও গড় উৎপাদন বের করা যায়)।

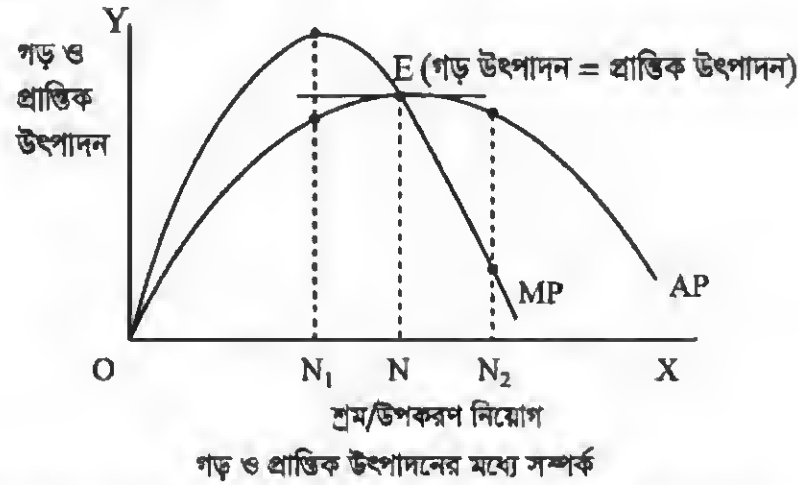
$$\text{গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

প্রান্তিক উৎপাদন : এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের (অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন) ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। শ্রম ব্যবহার করলে শ্রমের বা মূলধন ব্যবহার করলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বলব। অর্থাৎ উপকরণ বা শ্রমিক নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। পরের পৃষ্ঠার সারণি থেকে দেখা যায় শ্রম উপকরণ ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ থেকে ২২ কুইন্টাল হয়। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হচ্ছে $(২২-১০) = ১২$ কুইন্টাল। একইভাবে উপকরণ নিয়োগ ৩০ এ বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০ কুইন্টাল। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হলো $(৩০-২২) = ৮$ কুইন্টাল।

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক : উৎপাদন ব্যবস্থায় গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নের চিত্রে AP হচ্ছে গড় উৎপাদন রেখা এবং MP হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ১. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এজন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদনের উপরে থাকে। চিত্রে ON_১ উপকরণ নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি।

২. প্রান্তিক উৎপাদন যখন কমতে থাকে তখন গড় উৎপাদনও কমতে থাকে। এ অবস্থায় গড় উৎপাদন রেখা প্রান্তিক উৎপাদন রেখার উপরে থাকে। চিত্রে ON_২ উপকরণ নিয়োগ স্তরে গড় উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়।

৩. গড় উৎপাদন যখন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা তখন গড় উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে। অর্থাৎ গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। চিত্রে ON উপকরণ নিয়োগ স্তরে E বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান।



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম উপকরণ নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ON পরিমাণ উপকরণ নিয়োগের পূর্বে ON_১ উপকরণ নিয়োগ স্তরে MP, AP উভয়ই বৃদ্ধি পায়, তবে MP বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থাকে উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান স্তর বলে। ON উপকরণ নিয়োগ স্তরে AP সর্বোচ্চ হয় এবং AP ও MP সমান হয়। আবার ON উপকরণ নিয়োগের পর যেমন ON_২ উপকরণ নিয়োগ স্তরে AP, MP উভয় কমতে থাকে, তবে AP এর চেয়ে MP বেশি হারে কমে। অতএব গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম পর্যায়ে গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি, তারপর প্রান্তিক উৎপাদন = গড় উৎপাদন এবং পরবর্তীতে প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম হয়।

৪.৫ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি বাড়াতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে উপকরণ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়াতে পারে। মনে করি আমাদের ভূমি ও শ্রম দুটি উপকরণ আছে। ভূমির পরিমাণ স্থির। প্রথমে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রান্তিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকে। একারণে প্রান্তিক শ্রমের বৃদ্ধির চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত বেশি পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। এর কারণ হলো অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করায় প্রতি একক শ্রমের জন্য ভূমি কম থাকে। ফলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একে বলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। নিম্নের সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা যায়।

সূচির মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি :

ভূমি (ভূমির পরিমাণ স্থির)	শ্রম উপকরণ (শ্রমিকের শ্রম ঘণ্টা)	উপকরণ সমমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ হেক্টর	১০	A	১০	১০
১ "	২০	B	২২	১২
১ "	৩০	C	৩০	৮
১ "	৪০	D	৩৪	৪

শ্রম ঘণ্টা = ১০, ২০, ৩০, ৪০।

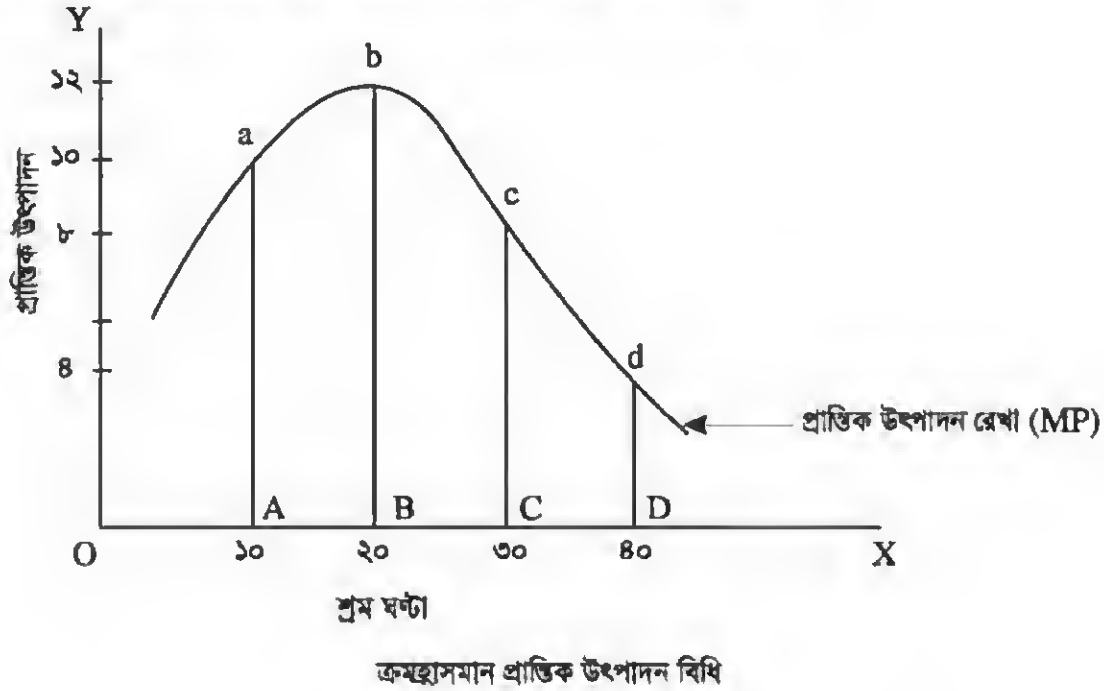
একজন শ্রমিকের এক ঘণ্টার কাজকে এক শ্রম ঘণ্টা বলে।

উপরের সূচি থেকে দেখা যায় যে, ১ হেক্টর জমিতে শ্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি করলে প্রথমে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। সমমিশ্রণ A অনুযায়ী ১ হেক্টর জমিতে ১০ শ্রম ঘণ্টা ব্যয় করে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১০ কুইন্টাল। B সমমিশ্রণ অনুযায়ী শ্রম ঘণ্টা দ্বিগুণ বা ২০ এ বাড়াতে মোট উৎপাদন ২২ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন $(২২-১০) = ১২$ কুইন্টাল হয়। এখানে উপকরণ ১০ শ্রম ঘণ্টা থেকে ২০ শ্রম ঘণ্টায় উন্নীত করলেও প্রান্তিক

১ হেক্টর = ২.৪৭ একর, ১ কুইন্টাল = ১০০ কেজি

উৎপাদন পূর্বের তুলনায় ২ কুইন্টাল বেশি। প্রথম পর্যায়ের এই উৎপাদনকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বলে। একই ভাবে C সর্গমিশ্রণের ক্ষেত্রে একই হারে শ্রম ঘণ্টা (উপকরণ) বাড়ানোর ফলে মোট উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ১২ কুইন্টাল থেকে ৮ কুইন্টালে নেমে আসে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে কমছে। উপকরণ বৃদ্ধির সংগে প্রান্তিক উৎপাদন কম হওয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

রেখা চিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো :



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম ঘণ্টা এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে শ্রম ঘণ্টার ধাপসমূহ হচ্ছে ১০, ২০, ৩০, ৪০। এদের প্রেক্ষিতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হলো Aa(১০), Bb(১২), Cc(৮), Dd(৬) কুইন্টাল।

প্রান্তিক উৎপাদন সর্গমিশ্রণ a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডান দিকে নিম্নগামী হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

৪.৬ উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)

রাজশাহীর নুরু মিয়া ২ একর জমিতে লিচু বাগান করেছেন। বাগানে প্রায় ১০০ টি লিচু গাছ আছে। এ বছর বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বাবদ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। লিচুর ফলনও ভালো হয়। নুরু মিয়া ও তার ছেলে ঘুম ও আরাম ত্যাগ করে বাদুড় ও অন্যান্য পাখির উপদ্রব থেকে বাগানকে রক্ষা করেন। এই লিচু বাগানের জন্য দুধরনের খরচ হয়। ১. উপকরণ বাবদ ব্যয় অর্থাৎ আর্থিক উৎপাদন ব্যয় এবং ২. ঘুম ও আরাম ত্যাগ অর্থাৎ মানবিক কষ্ট, একে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

১. আর্থিক উৎপাদন ব্যয় (Financial Cost of Production) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে উৎপাদককে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এই উপকরণগুলোর জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়, কাঁচামালের জন্য ব্যয়, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতি, স্থির জমি, ঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এসব ব্যয়কে আর্থিক উৎপাদন ব্যয় বলে।

২. **প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় (Real Cost of Production) :** এ ধরনের ব্যয় একটি মানসিক ধারণা, যা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা যায় না। যেমন, নুরু মিয়া ও তাঁর ছেলের ঘুম ও আরাম ত্যাগ, লেখকের বই লেখার সময়ে আরাম, আনন্দ, বিশ্রাম, ঘুম ত্যাগ। আবার শ্রমিকের শ্রম যোগান দিতে বিশ্রাম ও আরাম ত্যাগ। এ ধরনের ব্যয়কে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

৪.৭ প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় (Explicit and Implicit Cost)

কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। যেমন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে কর্মরত মানুষের বেতন ও ভাতাদি, কাঁচামাল, মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের স্থির ব্যয় যেমন, বাড়ি ভাড়া, মূলধনের সুদ ইত্যাদি।

অ-প্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্ব-নিয়োজিত সম্পদের খরচ যেমন, নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো, ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসেব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এ ক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অ-প্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

কাজ : একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ? দলগতভাবে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদন ও উপকরণ বলতে কী বোঝায়?
২. কৃষি উৎপাদনে কয়েকটি উপকরণের নাম লিখ।
৩. সংগঠক-এর ধারণা দাও।
৪. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমভ্রাসমান হয় কেন?
৫. ক্রমভ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মূল কথাটি কী?
৬. আর্থিক ও প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা দাও।
৭. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় কী? উদাহরণসহ ধারণা দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টির পাঁচটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
২. উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৩. সংগঠনে বিকাশ কীভাবে হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৪. একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৫. মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৬. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

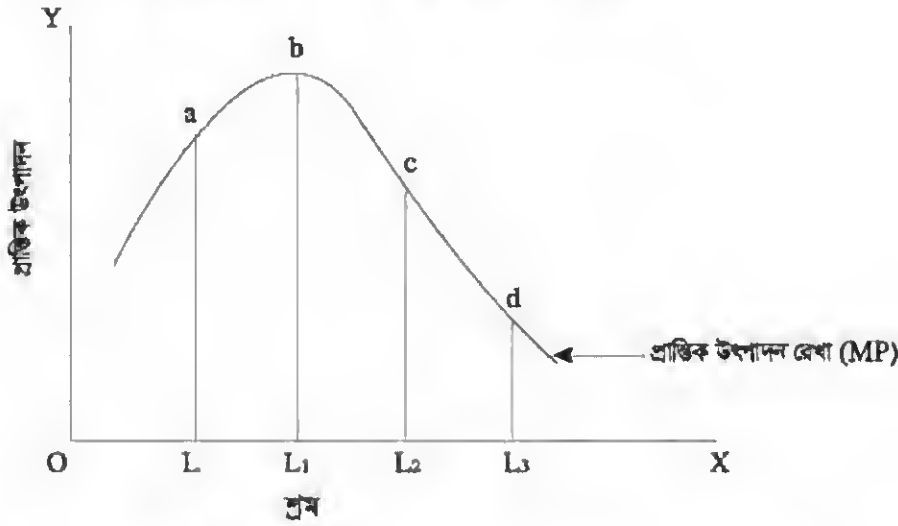
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ২টি | খ. ৪টি |
| গ. ৬টি | ঘ. ৮টি |

২. কোন ধরনের ব্যয় কার্যের হিসাব বইতে থাকে না?

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ক. স্থির ব্যয় | খ. মোট ব্যয় |
| গ. প্রকাশ্য ব্যয় | ঘ. অ-প্রকাশ্য ব্যয় |



উপরের চিত্রটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. সর্বোচ্চ প্রান্তিক উৎপাদন বিন্দুতে শ্রমের পরিমাণ কতটুকু?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ক. OL | খ. OL ₁ |
| গ. OL ₂ | ঘ. OL ₃ |

৪. গচ রেখার উপরোক্ত আকৃতি থেকে বোঝা যায়-

- i. উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে
- ii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে
- iii. উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবির একজন ব্যবসায়ী। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর কয়েকটি ফার্নিচারের দোকান আছে। তিনি ৩০ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ করেন। পণ্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে থাকেন। বাজারে তার আসবাবপত্রের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ক. শ্রম কাকে বলে?

খ. ক্রমব্রাসমান উৎপাদন বিধি বলতে কী বুঝায়?

গ. কবিরের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিরকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. হোসেন আলী প্রথম বছর তাঁর নিজের এক একর জমিতে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক শ্রম নিয়োগ করে যে উৎপাদন পান তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো-

শ্রমিকের সংখ্যা	ধানের মোট উৎপাদন (প্রতিকেজি ২০ টাকা)	ধানের উৎপাদন মূল্য (টাকায়)	প্রান্তিক উৎপাদন
১	৫০	১০০০	১০০০
২	১০০	-	-
৩	১৩০	-	-
৪	১৫০	-	-

ক. মোট উৎপাদন কাকে বলে?

খ. ব্যক্তিগত ব্যয় বলতে কী বুঝায়?

গ. উপরের ছকটি পূরণ করে এর মূল ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সারণিতে উপস্থাপিত বিষয়টি বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রেও প্রযোজ্য- মতামত দাও।

পঞ্চম অধ্যায়
বাজার
Market

অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটি একটি পণ্যের চাহিদা, যোগান ও দাম নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বাজার ধারণাকে সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে, পরিধি অনুসারে, দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বাজার রয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন দেখা যায়।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা-

- বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বাজার বিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারব
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে তুলনা করতে পারব
- বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থার ধরন চিহ্নিত করতে পারব
- দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রভাব জানতে উৎসাহিত হব
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরন চার্ট অংকন করে দেখাতে পারব

৫. বাজার (Market)

সুবেদ আলী একজন চাকুরিজীবী। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য নিউ মার্কেট গেলেন। মাছ, তরিতরকারি, চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জিনিসের দাম যাচাই করে কিনলেন। বিক্রেতার নগদ টাকার বিনিময়ে সুবেদ আলীর কাছে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করলেন। শ্রাবণী অনলাইনে একটি পোশাক ক্রয়ের অর্ডার দেয়। যথাসময়ে পোশাকটি পেয়ে দাম পরিশোধ করে। ওপরের ঘটনা দু'টিতে একটি পণ্যকে ঘিরে ক্রেতা ও বিক্রেতার যে সংযোগ ঘটে, তাকেই বাজার বলে।

অর্থনীতিতে বাজার বলতে শুধু বেচা-কেনার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। বরং বাজার হলো একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা হয়। যেমন অনলাইনে বেচা-কেনা, টেলিফোন ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে বেচা-কেনা। এ ধরনের বাজারে বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা বা বিশেষায়িত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। যেমন টেলিফোনের মাধ্যমে সিমেন্ট কেনা-বেচা ইত্যাদি।

দ্রব্যের ধরন অনুযায়ী বাজার ভিন্ন হতে পারে। যেমন, পাটের বাজার, চালের বাজার, শ্রমের বাজার, চায়ের বাজার, স্বর্ণের বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি। আবার সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে অতি অল্প সময়ের বাজার, স্বল্প সময়ের বাজার, দীর্ঘ সময়ের বাজার রয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এই নিয়মকে দামের নিয়ম বলে। এ দামের উপর দ্রব্যের বেচা-কেনা নির্ভর করে। দাম নির্ধারিত হলে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা করে। চাহিদা ও যোগান শক্তি দাম নির্ধারণ করে।

ফরাসি অর্থনীতিবিদ কুর্নট এর মতে, “অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝান নি। বরং যেকোনো অঞ্চলের সমগ্রটিকে বোঝান, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবাধ সংযোগের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম সহজে ও দ্রুততার সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।”

কাজ : বাজারের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

৫.১ বাজারের বিকাশ (Market Expansion)

বাজারের ধারণায় যে মৌলিক বিষয়গুলো কাজ করে তা হলো চাহিদা, যোগান, সময় এবং দাম।

বাজার ব্যবস্থায় একটি সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা দরকষাকষি করে দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারণ করে বেচা-কেনা করে। এই ধারণার প্রেক্ষিতে সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের বাজার ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে এবং বাজার ব্যবস্থার বিকাশ লাভ করেছে।

সময়ের প্রেক্ষিতে বাজারের উৎপত্তি বিভিন্ন ধরনের হয়েছে।

১. **অতি স্বল্পকালীন বাজার :** যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। চাহিদার বৃদ্ধি হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সকালের কাঁচা বাজার। এ ধরনের বাজারে সকালে স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি হলেও এই অল্প সময়ে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না।
২. **স্বল্পকালীন বাজার :** চাহিদার পরিবর্তন হলে যোগান খানিকটা সাড়া দিতে সক্ষম। এই বাজারে ফর্ম নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থেকে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগানে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে ফর্ম উৎপাদন করতেও পারে বা বাজারের অবস্থা খুব খারাপ হলে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনে যোগান কিছুটা সাড়া দিতে সক্ষম হয়।
৩. **দীর্ঘকালীন বাজার :** চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনের সাথে যোগানের যেকোনো পরিবর্তন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কোনো উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের আয়তন এবং উপকরণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি বহুদিন ধরে চলতে থাকলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তন করে উৎপাদন এবং যোগানের সাথে সমন্বয় করে ভারসাম্য থাকার চেষ্টা করে।

অঞ্চল ভেদে বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

- **স্থানীয় বাজার:** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে সে দ্রব্যের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। যেমন, মাংসের বাজার।
- **জাতীয় বাজার:** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যে দ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন, মোটা চালের বাজার।
- **আন্তর্জাতিক বাজার:** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা দেশের ভূখন্ডের বাইরেও বিস্তৃত থাকে যে দ্রব্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন- তৈরি পোশাক।



বাজার ধারণার সাথে কয়েকটি মৌলিক বিষয় রয়েছে—

ফার্ম : একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে । যেমন- স্টার জুট মিল ।

শিল্প : একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলা হয় । যেমন, স্টার জুট মিল, হাফিজ জুট মিল ইত্যাদি ফার্মের সমন্বয়ে পাট শিল্প গড়ে উঠে ।

উপকরণ বাজার : উৎপাদনে ব্যবহৃত যেকোনো মৌলিক উপাদানকে উপকরণ বলে । অন্যভাবে, উৎপাদন ব্যবস্থায় যা ব্যবহৃত হয় তাকে উপকরণ বলে । যে প্রক্রিয়ার উপকরণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচা-কেনা হয় তাকে উপকরণ বাজার বলে । উপকরণের বেচা-কেনা উপকরণের মূল্যের উপর নির্ভর করে । উপকরণের চাহিদা ও যোগান দ্বারা উপকরণের মূল্য নির্ধারণ হয় ।

৫.২ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণি বিভাগ

আগের অনুচ্ছেদে সময় অনুসারে বাজারের ধরন, স্থান বা আয়তন অনুসারে বাজারের ধরন সম্পর্কে আমরা পরিচিত হয়েছি । এখন সমগ্র বাজার কাঠামোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আলোচনা করব । সত্যিকার অর্থে এ ধরনের বিশ্লেষণই অর্থনীতির জন্য বেশি তাৎপর্যপূর্ণ । প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরনসমূহ হচ্ছে : ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার । অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার প্রধানত ৩ প্রকার । ক. একচেটিয়া বাজার খ. অলিগপলি বাজার গ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার ।

নিচে অতি সংক্ষেপে এ ধরনের কয়েকটি বাজারের ধারণা দেওয়া হলো।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজার ব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করেন। বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হলে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান বাজারের একটা নগণ্য অংশ মাত্র। সুতরাং একজন বা অল্প কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্যের বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একবার দাম নির্ধারিত হলে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে তা মেনে নিতে হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১. অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো দ্রব্যের অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে।
২. দ্রব্যের একক সমজাতীয় : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিবেচিত পণ্য সমজাতীয় বা একই গুণসম্পন্ন হয়। পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে পণ্যের একটি একক অন্য একক থেকে পৃথক করা যায় না। সেসব দ্রব্যের এককগুলো গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকীকরণ করা যায় তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে। যেমন, কলম, চাল, ডাল ইত্যাদি।
৩. ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত : বাজার ব্যবস্থা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হলে পণ্যের এককের গুণাগুণ এবং দাম সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি অবহিত থাকে।
৪. শিল্পে ফার্মসমূহের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের অধীনে শিল্পে ফার্ম দীর্ঘকালীন সময়ে অবাধে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে শিল্প ত্যাগ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ থাকে না।
৫. বাহ্যিক প্রভাব নেই : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন, দাম নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইরের বা সরকারি প্রভাব থাকে না। মোট কথা হচ্ছে, কর আরোপ, ভর্তুকি প্রদান, রেশনিং ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার প্রভাব সৃষ্টি করে না।
৬. উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উপকরণের অবাধ বিচরণ থাকে। শ্রম উপকরণসহ অন্যান্য উপকরণ বিচরণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ থাকে না। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উপকরণের গতিশীলতা থাকায় উপকরণ দাম সর্বত্র সমান থাকে।
৭. নির্দিষ্ট দামে উৎপাদনকারী মুনাফা সর্বোচ্চকরণের প্রচেষ্টা নেয় : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের মূল লক্ষ্য থাকে সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। প্রদত্ত দামে ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘমেয়াদে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। মনে রাখা দরকার যে মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হলে তাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে।
৮. উৎপাদিত পণ্যের একক বিভাজ্য : বিভিন্ন বাজারে সমজাতীয় বিভিন্ন পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হয়। প্রতিটি ফার্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে দ্রব্য উৎপাদন করে। তাই উৎপাদিত পণ্যের বাজার বিভাজ্য বলা যায়।

একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)

মনো (Mono) অর্থ এক, পলি (Poly) অর্থ বিক্রেতা। ফলে মনোপলি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একজন মাত্র বিক্রেতা। মনোপলি কথটির অভিধানগত অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি, সরকার অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার। অতএব, যখন কোনো ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয় তখন সেই ফার্মকে একচেটিয়া কারবারি এবং যে বাজারে ঐ দ্রব্যটি কেনা-বেচা হয় সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। যে দ্রব্য বিক্রয়ে যে ফার্ম একচেটিয়া অধিকার লাভ করে সেই ফার্ম বাজারে সেই দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। এই ফার্মটি ছাড়া আর অন্য কোনো ফার্ম একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন করতে পারে না বলে একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। পুরোপুরি একচেটিয়া বাজার বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে প্রায় একচেটিয়া বাজারের বেশ কয়টি উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন, বাংলাদেশ অক্সিজেন, তিতাস গ্যাস ইত্যাদি।

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopoly Market)

একচেটিয়া বাজার বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়।

১. বিক্রেতা উৎপাদন বা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে : একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা থাকে। তাই বিক্রেতা বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
২. নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই : একচেটিয়া ফার্ম যে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রি করে সে দ্রব্যের তেমন কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই। অর্থাৎ দ্রব্যটির সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় না।
৩. সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা : একচেটিয়া কারবারির লক্ষ হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।
৪. একচেটিয়া কারবারির ফার্ম ও শিল্প একই : একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম থাকে। ফলে সে ফার্মটিই শিল্প হিসেবে পরিচিত।
৫. এককভাবে দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রক : একচেটিয়া ফার্ম এককভাবে উৎপাদন যোগান দিয়ে থাকে। একমাত্র উৎপাদক হওয়ায় খুব সহজেই দ্রব্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে ফার্মটি হয় দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে; একসঙ্গে দুটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
৬. নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ : একচেটিয়া শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশের সুযোগ নেই। নতুন ফার্মের প্রবেশ করতে গেলে একচেটিয়া ফার্ম পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে নতুন ফার্ম সম্ভাব্য লোকসানের ভয়ে প্রবেশ করে না। সে জন্যই একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না।

কাজ : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা কর।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বাজার (Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য একযোগে দেখা যায়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ হলেও অভিন্ন নয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের উপকরণ বিদ্যমান। আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপকরণও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে উঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন গায়ে মাখার সাবান। বিভিন্ন কোম্পানির গায়ে মাখার সাবান ব্যবহার একই ধরনের হলেও এই সাবানগুলো পৃথক করা সম্ভব। যেমন মোড়ক ভিন্ন বা গন্ধ ভিন্ন ইত্যাদি। এই সব সাবানের যেকোনো একটির দাম বাড়লে, সাবানটির চাহিদা সামান্য কমেতে পারে, তবে শূন্য হয় না। এই সাবানের ভক্ত ক্রেতা সব সময় এই সাবানটিই কেনে। এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও ক্রেতা দ্রব্য ভোগ ও ব্যবহার ত্যাগ করে না।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

১. ফার্ম/বিক্রেতার সংখ্যা : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ফার্মের সংখ্যা অসংখ্য। এক একটি ফার্ম বাজারে মোট উৎপাদনের একটি সামান্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে কোনো ফার্মের পক্ষেই পণ্যের মূল্য বা মোট উৎপাদনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এজন্য অনেক সময় জোট বা দলভুক্ত ফার্ম থাকে।
২. উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার অধীনে বিভিন্ন ফার্ম যে সব পণ্য উৎপাদন করে সেগুলো অনেকটা সদৃশ হলেও একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব। দ্রব্যগুলো গুণগত ও বাহ্যিক দিক থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে। অর্থাৎ দ্রব্য পৃথকীকরণের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য সমজাতীয় নয়। এজন্যই একচেটিয়া প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়।
৩. শিল্পে ফার্মের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো ফার্মের শিল্পে প্রবেশ এবং প্রস্থানে কোনো বাধা নিষেধ নেই। সাধারণত স্বল্পমেয়াদে কোনো ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা করলে দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে। আবার কোনো ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে দীর্ঘমেয়াদে শিল্প পরিত্যাগ করতে পারে। এ ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো বাধা নেই।
৪. বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ : প্রত্যেকটি ফার্ম তার পণ্যের বিক্রি বাড়াতে বেশি প্রচার করে। বেশি প্রচারের ফলে এই ফার্মগুলোর বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক বিক্রয়জনিত ব্যয় বেড়ে যায়। প্রচার ও দ্রব্যের গুণগতমানের মাধ্যমে এই ফার্মগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
৫. চাহিদার প্রকৃতি : কোনো ফার্ম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে অনেক ভোক্তা অপর ফার্মের পরিবর্তক দ্রব্য ক্রয় করলেও এমন কিছু ভোক্তা থাকে যারা প্রথম ফার্মের পণ্যই কম পরিমাণে হলেও ক্রয় করে। অর্থাৎ কোনো ফার্ম পণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি করলেও সেই পণ্যের চাহিদা শূন্য হয় না। প্রতিটি ফার্মের জন্য কিছু কিছু ক্রেতার বিশেষ পছন্দনীয়তা থাকে বলে প্রতিটি ফার্মের চাহিদা রেখার আকৃতি সাধারণত এক রকম হয় না। চাহিদা রেখার আকৃতি মূলত নির্ভর করে বিবেচনাধীন ফার্মের দ্রব্য অপরাপর ফার্মের দ্রব্যের সাথে কতটুকু পৃথক তার উপর।

৬. **মুনাফা সর্বোচ্চকরণ** : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার লক্ষ্য থাকে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা।
৭. **দ্রব্যের অনুকরণ** : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একজন বিক্রেতা অপর একজন বিক্রেতার উৎপাদিত দ্রব্য পূর্ণ অনুকরণ করতে পারে না। ফলে প্রত্যেক বিক্রেতা বা ফার্ম একচেটিয়া কার্মের মতো নিজ নিজ দ্রব্যের যোগান বা যোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৮. **দীর্ঘকালীন পরিস্থিতি** : দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ফার্মের মতো স্বাভাবিক মুনাফা স্তরে হয়ে থাকে।

অলিগপলি বাজার

অলিগপলি এমন এক বাজার ব্যবস্থা যেখানে কতিপয় বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করেন, এ ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেমন, টেলিযোগাযোগ খাতের “ ফার্ম তার পণ্যের বিজ্ঞাপনে একজন চলচ্চিত্রের নায়ককে ব্যবহার করেন। সেটা পর্যবেক্ষণ করে “ ফার্ম তার বিজ্ঞাপনে একজন জনপ্রিয় খেলোয়ারকে ব্যবহার করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।

অলিগপলি বাজারের বৈশিষ্ট্য : (Characteristics of Oligopoly Market):

১. বিক্রেতার সংখ্যা এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে কতিপয় বিক্রেতা থাকে।
২. দ্রব্যের প্রকৃতি: এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে সমজাতীয় অর্থাৎ একই ধরনের বা প্রায় সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকরণ করা যায়।
৩. সিদ্ধান্তগ্রহণ: এ ধরনের দ্রব্যের বাজারের একটি ফার্ম তার দ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
৪. বিজ্ঞাপনের প্রভাব: এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে ফার্ম সমূহ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

কাজ : প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি কর।

বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা (Market System of Bangladesh)

এ অধ্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার, একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাজার এবং বেচা-কেনার ধরন লক্ষ করা যায়। বাস্তব উদাহরণ এই তিন ধরনের বাজার নিয়ে আলোচনা করা যায়।

১. **বাংলাদেশে কোনো পণ্যের বিস্তৃত পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার নেই তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কাছাকাছি বাজার লক্ষ করা যায়।** বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার এ বাজারের ভালো উদাহরণ। যেমন, ধানের প্রাথমিক বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং কোনো একজন উৎপাদকে ধানের বাজারকে প্রভাবিত করতে পারেনা। এ ভাবে অন্যান্য খাদ্যশস্য, মাছ, মুরগি, ডিম, দুধ প্রভৃতির বাজারও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা তার কাছাকাছি। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে এ বাজার দেখা যায়। যেমন- রিক্সা পরিবহন।
২. **একচেটিয়া বাজার :** বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দেখা যায় না। তবে আমদানিকৃত পণ্য কিংবা সেবার ক্ষেত্রে এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন- জ্বালানি তেলের একমাত্র আমদানিকারক বাংলাদেশ

পেট্রোলিয়াম করপোরেশন। ঢাকা শহরে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার বিদ্যমান। রেলপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে একক প্রতিষ্ঠান।

৩. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার : বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্যের বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক। যেমন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী দ্রব্য। কোনো কোনো সেবার ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন- বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

কাজ: নিম্নলিখিত পণ্যগুলি স্থানভেদে কোন ধরনের বাজার তা উল্লেখ করে যুক্তি দাও।

পণ্যের নাম	বাজারের নাম ও যুক্তি
ক. আম
খ. কাঁঠাল
গ. তরিতরকারি
ঘ. মাছ
ঙ. তাঁত কাপড়
চ. চা
ছ. পেয়ারা, কলা, বরই
জ. নারিকেল
ঝ. গো-দুধ
ঞ. মাংস

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাজার বলতে কী বোঝায়?
২. মূল্যের নিয়ম কী?
৩. বাজার ব্যবস্থায় তিনটি মৌলিক বিষয় কী কী?
৪. সময়ের প্রেক্ষিতে বাজার কত ধরনের হয় এবং কী কী?
৫. স্থানভেদে বাজার কয় ধরনের হয় এবং কী কী?
৬. অর্থবাজার কী?
৭. শ্রমবাজার বলতে কী বোঝায়?
৮. দ্রব্য বাজারের ধারণা দাও।
৯. ফার্ম ও শিল্পের ধারণা দাও।
১০. উপকরণ বাজার কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে বাজারের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর।
২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ৮টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩. একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৪. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৫. তোমার বইয়ে উল্লিখিত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কাঠামোর একটি ছক তৈরি কর। বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের বাজার ব্যবস্থার পরিচিতি দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পণ্যের গুণাগুণ এবং দাম সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি জানে' বৈশিষ্ট্যটি কোন বাজারের?

- ক. একচেটিয়া
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা
- গ. অলিগপলি
- ঘ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতা

২. দামের নিয়মে বেচাকেনা হলো-

- i. ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়
- ii. চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়
- iii. নির্দিষ্ট মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সিদ্দিক সাহেব রাস্তার পাশের বাজার থেকে ছোট মাছ, মুরগী নিয়ে ৮টার সময় বাসায় আসেন, মিসেস সিদ্দিক সবজি আনতে বললে তিনি বলেন, এখন তো আর পাওয়া যাবে না।

৩. জনাব সিদ্দিক কোন ধরনের বাজার থেকে মাছ, মুরগী ক্রয় করেন?

- ক. অতি স্বল্পকালীন
- খ. দীর্ঘকালীন
- গ. অতি দীর্ঘকালীন
- ঘ. স্বল্পকালীন

৪. উক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো-

- i. দ্রব্যের কেনাবেচার জন্য অনেক লোকের আগমন
- ii. বিক্রিত দ্রব্যগুলোর গুণাগুণ ও গঠন প্রকৃতি একই ধরনের।
- iii. একই ব্যক্তি বাজারের দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কামাল : আমাকে একটি ম্যাটাডর কলম দিন।

দোকানদার : ভাইয়া এ সত্তাহে ইকোনো কলমের দাম কমেছে, নেবেন কি?

কামাল : কেন ম্যাটাডর থেকে ইকোনো কলম কি মানে- গুণে আলাদা?

দোকানদার : না তেমন নয়। বাজারে অনেক কোম্পানি আছে তাদের সবার কলম প্রায় একই মানের কেবল দেখতে সামান্য ভিন্ন।

কামাল : তাহলে আমাকে ম্যাটাডরই দিন। এটিই আমার ভালো লাগে।

ক. ফার্ম কাকে বলে?

খ. স্বল্পকালীন বাজারের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. কামালের ক্রয়কৃত দ্রব্যটি কোন বাজারের পণ্য? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে কামালের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

২. রিমি একটি নির্দিষ্ট ব্রান্ডের ব্যাগ ব্যবহার করে। সে নতুন একটি ব্যাগ বাজারে কিনতে গেলে দাম আগের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায়। এর কারণ জানতে চাইলে দোকানী জানায় যে উক্ত ব্যাগ একটি মাত্র কোম্পানি আমদানি করে। কোম্পানি দাম বাড়ালে তাদের কিছু করার থাকে না। অনুরূপ কোনো ব্যাগ বাজারে না থাকায় রিমিকে উচ্চ দরে ব্যাগটি ক্রয় করতে হয়।

ক. উপকরণ কাকে বলে?

খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ বলতে কী বোঝায়?

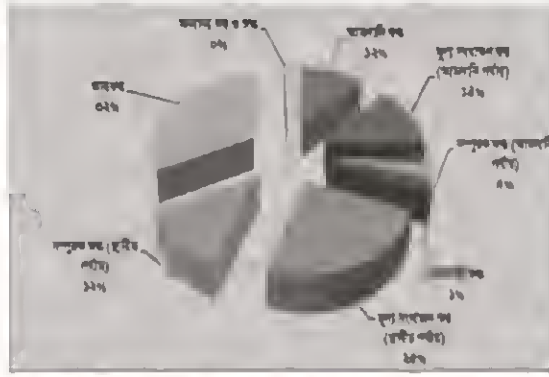
গ. রিমির ক্রয়কৃত পণ্যটি কোন বাজারের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশে রিমির ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের পরিধি কতটুকু? বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ

National Income and Its Measurements

একটি দেশের জাতীয় আয় থেকে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায়। অর্থাৎ দেশটি কি উন্নত, উন্নয়নশীল না অনুন্নত এ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কোনো দেশের জাতীয় আয় কত তা জানার জন্য জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- জাতীয় আয়ের (NI) সাথে মোট দেশজ উৎপাদের (GDP) পার্থক্য দেখাতে পারব
- জাতীয় আয়ের (NI) সাথে নিট জাতীয় উৎপাদের (NNP) তুলনা করতে পারব
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- জিডিপি নির্ধারকসমূহকে উপকরণ এবং প্রযুক্তি এই দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারব
- জিডিপি হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করতে পারব
- বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব

৬.১ জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ (Concepts of National Income)

মোট দেশজ উৎপাদ (Gross Domestic Product (GDP))

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদ বা GDP বলে।

দুই খাত বিশিষ্ট সরল অর্থনীতির ক্ষেত্রে-

মনে করি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বছরে তিনটি দ্রব্য উৎপাদন হয়। যেমন- ১০০ কুইন্টাল ধান, ১০০০ জামা এবং ১০০০ কলম উৎপাদিত হয়। জিডিপি = ১০০ কুইন্টাল ধান × ধানের বাজার দাম + ১০০০ জামা × জামার বাজার দাম + ১০০০ কলম × কলমের বাজার দাম। এভাবে কোন দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্যের পরিমাণকে নিজ নিজ দাম দ্বারা গুণ করে তার সমষ্টি বের করে জিডিপি নির্ণয় করা হয়।

মোট জাতীয় আয় (Gross National Income বা GNI)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে।

মোট দেশজ উৎপাদের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগ ফলকে বোঝায়।

নিট জাতীয় আয় (Net National Income বা NNI)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় (Capital Consumption Allowance বা CCA বা Depreciation) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে। মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে বোঝায়।

কাজ : (১) GNI, GDP, CCA এদের পূর্ণ রূপ দাও।

কাজ : (২) CCA = Capital Consumption Allowance আসলে কী?

৬.২ জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ-উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি (Measurements of National Income-Production, Expenditure and Income Approach)

জাতীয় আয় মূলত তিনভাবে পরিমাপ করা যায়। যথা : উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach), আয় পদ্ধতি (Income Approach) ও ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach)।

১. **উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach)** : একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারী উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদ নির্ধারণ করা হয়।

২. **আয় পদ্ধতি (Income approach)** : এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। অতএব জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

৩. **ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure approach)** : এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি (= রপ্তানি - আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদ। মোট দেশজ উৎপাদ বা $Y = C + I + G + (X - M)$ এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, $(X - M)$ (রপ্তানি - আমদানি) = নিট রপ্তানি।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত মোট দেশজ উৎপাদ একই পরিমাণ হবে। গণনা বা হিসাবের ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে খানিকটা পার্থক্য হতে পারে, তবে প্রকৃত অর্থে তা একই ফলাফল বহন করে।

৬.৩ মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদ (Per Capita Gross Domestic Product)

মাথাপিছু জিডিপি বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

$$\text{সূত্রাকারে, মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোন নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদ}}{\text{ঐ সময়ে মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক। এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে জিডিপি কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল।

৬.৪ জিডিপি-এর নির্ধারকসমূহ (Determinants of Gross Domestic Product-GDP)

মোট দেশজ উৎপাদ কত হবে তা নির্ভর করে দেশের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি, সম্পদের সচলতা (mobility) এসবের উপর। এজন্য এদেরকে মোট দেশজ উৎপাদ-এর নির্ধারক বলা হয়।

১. **ভূমি (Land)** : মোট দেশজ উৎপাদ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. **শ্রম (Labour)** : যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির সহায়ক। শ্রমিক যদি প্রযুক্তির ব্যবহার জানে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তবে মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

৩. **মূলধন (Capital)** : মূলধন মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলধনের অভাবের কারণে মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতরাং মূলধন মোট দেশজ উৎপাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

৪. **প্রযুক্তি (Technology)** : প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদ বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন, নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, টেঁড়শ ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে।

৫. **সচলতা (Mobility)** : একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর এর মোট দেশজ উৎপাদ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে পাট চাষ কমিয়ে ধান, গম বা ভুট্টা চাষে ভূমি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি।

৬.৫ জিডিপি-এর হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি (Factors not included in GDP Calculation)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) বলে। জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ কখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

১. **মূলধনী লাভ-ক্ষতি (Capital gains & losses)** : সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না। তাছাড়া এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের লাভ যতটুকু হয় অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। ফলে জিডিপি গণনায় লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য।

২. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা (Intermediary goods and services)** : জাতীয় আয় গণনায় শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকে জিডিপি গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

৩. **বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা (Goods and services free of charge)** : অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন- মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্না বান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি উৎপাদিত পণ্য নয়। এজন্য জিডিপি গণনায় এসব সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

৪. **অতীতে উৎপাদিত পণ্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় (No consideration of previous production and transaction)** : যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপি-এর মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে দ্বিতীয় গণনা সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বণ্ড, কাগজি লেনদেন জিডিপি-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৫. **সরকারি ঋণের সুদ (Interest on public debt) :** সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেয়া হয় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- যুদ্ধকালীন সরকার যে ঋণ করে তা জাতীয় উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এ ঋণের বিপরীতে সুদ হস্তান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য জিডিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়।
৬. **বেআইনি কাজ (Illegal activities) :** বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। বেআইনি কার্যকলাপ বলতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজকে বোঝায়।

কাজ : মোট দেশজ উৎপাদে গণনা করা হয় না, এমন সব দ্রব্য ও বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৬.৬ বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি (Method of Estimation of National Income in Bangladesh)

বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি বছর চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি ও জিএনআই গণনা করে থাকে। এসব হিসাব করতে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি ও জিএনআই গণনা করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। খাতসমূহ হচ্ছে-

উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ :

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান :

১. **কৃষি ও বনজ সম্পদ :** কৃষি দেশজ উৎপাদ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত ধরাবাঁধাভাবে হিসাব করা কঠিন। বাংলাদেশে GDP গণনা করতে এ খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়।
 - (ক) **শস্য ও শাকসবজি :** এখাতে দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ চলতি পাইকারি বাজার মূল্যের প্রেক্ষিতে হিসাব করা হয়। যেমন- ২০১২-১৩ সালে এখাতে উৎপাদন ছিল ১,০৬,৭৯৪ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ১,১৭,৯০৩ কোটি টাকা।
 - (খ) **প্রাণি সম্পদ :** এখাতের হিসাবও চলতি বাজার মূল্যের প্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ হিসাব করা হয়। প্রাণি সম্পদ উপ খাতে ২০১২-১৩ সময়ে দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ ছিল ২৫,৩৫৯ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ সালে ২৭,৬৬৭ কোটি টাকা।

- (গ) বনজ সম্পদ : বন খাতের উপকরণের তথ্যের অভাবে মোট উৎপাদন হতে ৩% মূল্য বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে মূল্য সংযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে GDP বের করা হয়। ২০১২-১৩ সালে দেশজ উৎপাদন ছিল ১৬,৬০৫ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ১৮,৩৯৮ কোটি টাকা।
২. মৎস্য সম্পদ : অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট মৎস্য আহরণের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদ এর হিসাব করা হয়। এখানে ২০১২-১৩ সালে মোট দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ ছিল ৩৬,৯৯৫ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ৪২,৩০৮ কোটি টাকা।
৩. খনিজ ও খনন : শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খননকে আলাদা খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ খাতে (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিিশোধিত তেল এবং (খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন বিষয়ের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্যের হিসাব করা হয়। এসব খাতের হিসাব দেশজ উৎপাদ এর দিক থেকে গণনা করা হয়। ২০১২-১৩ সালে এ খাতে আয় হয় ১৯,৪৬১ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে হিসাব করা হয়েছিল ২১,০৮০ কোটি টাকা।
৪. শিল্প (ম্যানু:) : বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদ গণনার ক্ষেত্রে সকল শীল্লের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বাজার মূল্য হিসাব করে মোট দেশজ উৎপাদ বের করা হয়। বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ২০১২-১৩ সালে ১,৯৭,১২৭ কোটি টাকা যার মধ্যে (ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের দেশজ উৎপাদন ১,৫৮,৪৪৮ কোটি টাকা এবং (খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খাতে ৩৮,৬৭৯ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ সালে শিল্প উৎপাদন যথাক্রমে ২,২৩,২২১ কোটি টাকা, ১,৮০,৩৮২ কোটি টাকা এবং ৪২,৮৩৯ কোটি টাকা।
৫. পাইকারি ও খুচরা বিপণন : এ হিসাবে পণ্যের পাইকারি মূল্য হিসাবের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ গণনা করা হয়। ২০১২-১৩ সালে ১,৫৪,৫৭৯ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ১,৭২,৫৭৫ কোটি টাকা হিসাব করা হয়।
৬. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ : এ খাতে সেবা সরবরাহ মূল্যের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদ মূল্য হিসাব করা হয়। বাংলাদেশের জন্য এই খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পাশাপাশি এ খাতসমূহ বেসরকারিভাবেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ সালে মোট দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ ছিল ১৬৩৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে (ক) বিদ্যুৎ উপখাতে ১২১৬৮ কোটি টাকা। (খ) গ্যাস উপখাতে ৩৪৪৮ কোটি টাকা এবং (গ) পানি উপখাতে ৭৬৬ কোটি টাকা আয় হয়। ২০১৩-১৪ সালে এ তিনটি খাতের সমষ্টি ১৮৪০১ কোটি টাকা।
৭. নির্মাণ : নির্মাণ খাত থেকে মোট দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ হিসাব করা হয় ব্যক্তি, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ভোক্তা এবং সরকারের প্রাপ্ত তথ্য থেকে। বাস্তবে এ খাত থেকে যে পরিমাণ আয় হিসাব হওয়ার কথা তার তুলনায় কম হয়। কারণ চলতি বাজার মূল্য সরকার প্রদত্ত বেঁধে দেয়া মূল্য থেকে বেশি। অথচ সরকারি বেঁধে দেয়া মূল্যের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ হিসাব করা হয়। ২০১২-১৩ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ৮২৪৩২ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ৯০৮৩৪ কোটি টাকা।
৮. হোটেল ও রেস্টোরাঁ : এই খাতের মোট দেশজ উৎপাদ এর বিষয়টি উৎপন্ন দ্রব্যের ও সেবার বিক্রয় মূল্যের প্রেক্ষিতে হিসাব করা হয়। ২০১২-১৩ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ১১২৬৩ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সময়ে ১৩০৩৫ কোটি টাকা।

৯. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ : এ খাত দেশজ আয় গণনার একটি বড় খাত। এ খাতটির বড় অংশ বেসরকারি হাতে ন্যস্ত আছে। তারপরও ২০১২-১৩ সালে স্থল আয় হয়েছিল মোট ১,২৪,২৮১ কোটি টাকা যার মধ্যে- (ক) স্থল পথ পরিবহন উপখাতে ৯২১৮৩ কোটি টাকা, (খ) পানি পথ পরিবহন উপখাতে ৭৬৪৯ কোটি টাকা, (গ) আকাশ পথ পরিবহন উপখাতে ১০৪৭ কোটি টাকা, (ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ উপখাতে ৬০০১ কোটি টাকা এবং (ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ খাতে ১৭৪০০ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ সময়ে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে মোট আয় হয় ১৩৪৩১৭ কোটি টাকা।
১০. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা : এ খাতের হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত মূল্যের ভিত্তিতে। ২০১২-১৩ সময়ে এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ ছিল ৪২২৩৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে- (ক) ব্যাংক উপখাতে ৩৪৭২৭ কোটি টাকা; (খ) বীমা উপখাতে ৪৯২০ কোটি টাকা এবং (গ) অন্যান্য খাত থেকে আয় হয় ২৫৯০ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৪৮৫৬৩ কোটি টাকা আয় হয়। উপখাত অনুযায়ী এ আয় যথাক্রমে ৪০৩৯০, ৫৩৬৪ ও ২৮১০ কোটি টাকা।
১১. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা : এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত আয় এর পরিমাপের ভিত্তিতে। ২০১২-১৩ সালে এ খাত হতে প্রাপ্ত দেশজ আয় ছিল ৭৮৮২০ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সময়ে ৯১২২৯ কোটি টাকা।
১২. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা : এ খাত থেকে প্রাপ্ত দেশজ আয়ের হিসাব করা হয় মূলত ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১২-১৩ সালে দেশজ উৎপাদ ছিল ৩৭৬৭৮ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ৪৪৭২৮ কোটি টাকা।
১৩. শিক্ষা : বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে মোট দেশজ উৎপাদ এর হিসাব করা হয় ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১২-১৩ সালে এ খাতে দেশজ উৎপাদ ছিল ২৮৪২৯ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ৩২৭৬৭ কোটি টাকা।
১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা : স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের বিষয়টি হিসাব করা হয় ব্যয় পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদ ব্যয় ২০১২-১৩ সময়ে হয়েছিল ২৩৮৬৮ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ সময়ে ব্যয় ২৬৯২৪ কোটি টাকা।
১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা : এ খাতে ব্যয়ের দিক থেকে মোট দেশজ উৎপাদ গণনা করা হয়। ২০১২-১৩ সালে এ খাত থেকে ১৩৮৯৫২ কোটি টাকা ব্যয় গণনা করা হয় এবং ২০১৩-১৪ বছরে ১৫৬৫৫২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মোট দেশজ উৎপাদের ধারণা দাও।
২. মোট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়?
৩. নিট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়?
৪. GNI, GDP, NNI এদের পূর্ণরূপ দাও।
৫. CCA বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।
২. মোট দেশজ উৎপাদের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর।
৩. মোট দেশজ উৎপাদের হিসাববহির্ভূত বিষয়সমূহের বর্ণনা দাও।
৪. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির উপখাতগুলোর অবদান বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে কী বলে?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক. জাতীয় আয় | খ. নিট আয় |
| গ. জিডিপি | ঘ. মাথাপিছু আয় |

২. জাতীয় আয় গণনায় নিচের কোনটি ধরা হয়?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য | খ. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবার মূল্য |
| গ. সরকারি ঋণের সুদ | ঘ. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

বুমানা তাঁর বাড়ির আঙিনায় সাধারণ বীজ বপন করে প্রথম বছর যে পরিমাণ সবজি পান পরের বছর উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে তার চেয়ে বেশি সবজি পান।

৩. বুমানা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন?

- | | |
|--------------|----------|
| ক. ভূমি | খ. শ্রম |
| গ. প্রযুক্তি | ঘ. মূলধন |

৪. উৎপাদন ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তন—

- i. GDP বৃদ্ধি করে
- ii. GNI বৃদ্ধি করে
- iii. NNI হ্রাস করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা : ১

শিহাব ১০ বছর যাবৎ বাহরাইনে কর্মরত। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে প্রেরণ করেন।

ঘটনা : ২

মিসেস ব্রাউনী বৃটেনের নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতিমাসে তিনিও তার দেশে টাকা পাঠান।

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে?

খ. আয় পদ্ধতিতে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়? বুলিয়ে লিখ।

গ. শিহাবের অর্থ প্রেরণ আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিসেস ব্রাউনীর আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? তোমার মতামত দাও।

২. জহির তার নানাবাড়ি মধুপুরে বেড়াতে যায়। তার নানা পুকুরে মাছ চাষ করেন। জহির তার নানাবাড়ির পাশে প্রচুর গাছপালা ও জীবজন্তু দেখতে পায়। সে জানতে পারে এটি একটি বিশেষ ধরনের অঞ্চল।

ক. CCA-এর পূর্ণরূপ কী?

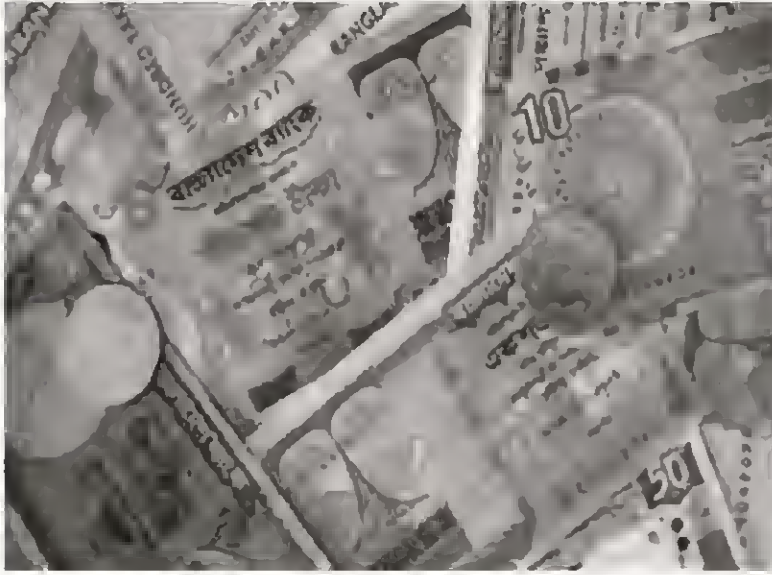
খ. মোট দেশজ উৎপাদ বলতে কী বোঝায়?

গ. জহির তার নানাবাড়ির পাশে যে অঞ্চলটি দেখতে পায় সেটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জহিরের নানার চাষকৃত মাছের অবদান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়
অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা
Money and Banking System

নাবিলের বাবা একজন চাকুরিজীবী। মাসের শেষে বেতন পান ২০,০০০ টাকা। তিনি পারিবারিক ব্যয়ের জন্য কিছু টাকা নগদ রাখেন এবং কিছু টাকা ব্যাংকে আমানত রাখেন। কিছুদিন পর তিনি ঠিক করলেন মুরগির খামার দেবেন। এজন্য তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন। ব্যাংক তাকে ১০% সুদে ৩৬ মাসে পরিশোধ করার শর্তে এই ঋণ প্রদান করে। তাঁর আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও ঋণ সবই অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অর্থ ও ঋণের ব্যবসা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ব্যাংক জনগণের উদ্ধৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন, আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্ন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- অর্থের ধারণা এবং অর্থের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব
- অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব
- বাণিজ্যিক ব্যাংক এর ধারণা এবং এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব
- ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা এবং এর প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করতে পারব
- কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব
- চার্ট অংকন করে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা প্রদর্শন করতে পারব

৭.১ অর্থ ও অর্থের প্রকারভেদ (Money and its classification)

দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষক তার ধানের বিনিময়ে তাঁতির কাছ থেকে কাপড় এবং জেলে তার মাছের বিনিময়ে কুমারের কাছ থেকে হাঁড়ি-পাতিল সংগ্রহ করত। এভাবে মানুষের এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে বিনিময় প্রথা (Barter System) বলে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো এ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। তবে এ প্রথায় লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা অসুবিধায় পড়তে হতো (যেমন- দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা ও অভাবের অমিল ইত্যাদি)। এসব অসুবিধা দূর করতে অর্থের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজন স্বীকৃত ও গৃহীত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সম্বলের বাহন হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সম্বলের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে। বিভিন্ন দেশে অর্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রুপি, আমেরিকায় ডলার এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইউরো।

অর্থের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

তৈরির উপকরণের দিক থেকে অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) ধাতব মুদ্রা

২) কাগজি নোট

ধাতব মুদ্রা

ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে, তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা আছে।



বর্তমানে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা

ধাতব মুদ্রাকে বস্তুগত মূল্যমানের দিক থেকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) প্রামাণিক মুদ্রা (খ) প্রতীক মুদ্রা। প্রামাণিক মুদ্রা বলতে বোঝায় যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়। আর প্রতীক মুদ্রা বলতে বোঝায়, যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে। সাধারণত ধাতব মুদ্রা সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয়।

কাগজি নোট

বেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে। নোটের উপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক বা সাধারণত অভ্যন্তরীণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। প্রায় সকল দেশেই কাগজি মুদ্রা বা নোট সরকারি নির্দেশে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের কাগজি মুদ্রা হলো ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

কাগজি মুদ্রাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা (খ) রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা। রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা বলতে বুঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট। আর রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রূপা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে রূপান্তর অযোগ্য কাগজি নোট হলো ১ টাকা ও ২ টাকার নোট। গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্ধেক আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১) বিহিত অর্ধ ২) ব্যাংক হিসাব।

বিহিত অর্ধ

যে অর্ধ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত অর্ধ বলে। আমাদের দেশের বিহিত অর্ধ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত খাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট নিয়ে গঠিত। বিহিত অর্ধকে দুভাগে ভাগ করা যায়- ক) অসীম বিহিত অর্ধ খ) সসীম বিহিত অর্ধ। অসীম বিহিত অর্ধ বলতে বোঝায় যে বিহিত অর্ধ দ্বারা আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। আমাদের দেশের অসীম বিহিত অর্ধ হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট। সসীম বিহিত অর্ধ বলতে বোঝায়, যে বিহিত অর্ধ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়, আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ইচ্ছা অনুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের সসীম বিহিত অর্ধ হলো- ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার খাতব মুদ্রা।

ব্যাংকস্ট অর্ধ

বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক স্ট অর্ধ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। তবে তা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা ঋণ প্রদান করে অর্ধ সৃষ্টি করতে পারে।



ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড

ব্যাংক স্ট আমানত বা গুতার ড্রাফটের বিপরীতে চেক কেটে লেনদেন করা যায়। ব্যাংক স্ট আমানত বা হিসাবকে অর্ধ হিসেবে গণ্য করা চলে। আমাদের দেশে ব্যাংক স্ট অর্ধ হলো- চলতি হিসাবে আমানত এবং সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত বা চেকের দ্বারা তোলা যায়। এছাড়া ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

কাজ : অর্থের প্রকারভেদের হুক তৈরি কর।

৭.২ অর্থের কার্যাবলি (Function of money)

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং সমাজ জীবনে অর্থ নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে।

কবি অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

যাহা করে বিনিময় ও মূল্য পরিমাপ

ঋণ পরিশোধ আর সঞ্চয় সাধন

অর্থ বলি গণ্য তারে করে সর্বজন।

ইংরেজি কবিতার দুটি চরণে অর্থের কার্যাবলি প্রকাশ পায়-

"Money is a matter of functions four;

A medium, a measure, a standard, a store."

অর্থাৎ, অর্থের কাজ হলো চারটি। যথা : বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন ও স্থগিত লেনদেনের মান।

নিচে অর্থের প্রধান চারটি কাজের বিবরণ দেয়া হলো :

বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। তাই বলা যায় অর্থ বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম।

মূল্যের পরিমাপক

মিটার যেমন দৈর্ঘ্যের, কিলোগ্রাম যেমন ওজনের পরিমাপক, ঠিক তেমনি অর্থ পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- আমিরা একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক। অর্থের সাহায্যে আমরা সহজেই পণ্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে অতীত ও ভবিষ্যতের পণ্য ও সেবার মূল্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

সঞ্চয়ের বাহন

অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সেবা জীবন্ত উপকরণ তাই শ্রম ও সেবা সঞ্চয় করে রাখা যায় না। কিন্তু অর্থ দ্বারা সব কিছু বিনিময় করা যায় বলে এরূপ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারে, কারণ অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় অনেক বেশি নিরাপদ ও তুলনামূলক স্থায়ী।

স্থগিত লেনদেনের মান

স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। এসব দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ অর্থের মাধ্যমেই করা হয়। অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ সহজ এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতে পারে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতিও ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে ঋণের ভিত্তি তথা স্থগিত লেনদেনের মান হিসেবে গণ্য করা হয়।

উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও অর্থ মূল্য স্থানান্তরের বাহন, তারল্যের মান ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। অর্থের এই কাজগুলো পৃথক নয়, এদের একটি অপরিটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই বলা হয় অর্থের সকল কাজের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে।

কাজ : অর্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করেছে- ব্যাখ্যা কর।

৭.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের উপর কম হারে সুদ দেয়। অন্যদিকে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ আদায় করে। উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। এ ব্যাংক জমাদানকারীকে তার জমাকৃত অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে বলে ব্যাংক তার তহবিল থেকে স্বল্পকালের জন্য ঋণ প্রদান করে। তাই এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদী ঋণের ব্যবসায়ী বলে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হলো : সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডাচবাংলা ব্যাংক ইত্যাদি।



সোনালী ব্যাংক ভবন



জনতা ব্যাংক ভবন

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

আধুনিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংক বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১) আমানত গ্রহণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে। যথা- (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত, (গ) স্থায়ী আমানত।

(ক) চলতি আমানত : চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যেকোনো সময় ওঠাতে পারেন। এজন্য এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।

(খ) সঞ্চয়ী আমানত : সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সাধারণত সপ্তাহে দুবার ওঠানো যায়। এই আমানতের উপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়।

(গ) স্থায়ী আমানত : এ আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন- ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের উপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। এক্ষেত্রে কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করতে যে তবে কম হারে সুদ প্রদান করা হয়।

২) ঋণ দান করা

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলতঃ অর্থের লক্ষ্যে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারীর চাহিদা মেটানোর জন্য পছন্দ রেখে বাকি অর্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান করে। উপযুক্ত জামানত ও বন্ধকির (যেমন- মূল্যবান ধাতু, ধাতব দ্রব্য, সরকারি ও দেশি-বিদেশি ঋণপত্র, স্থায়ী সম্পদ-এর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক গৃহনির্মাণ, মৎস্য চাষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দেয়।

৩) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে চেক, ব্যাংক ড্রাকট, ই-পেমেন্ট, হুডি ও ড্রপকারীর চেক ইত্যাদি সৃষ্টি করে। বিনিময় মাধ্যমগুলোর মধ্যে ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক বহুল ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৪) দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তার ব্যবসায়ীদের অর্থ যোগান দেওয়ার পাশাপাশি পরামর্শও দিয়ে থাকে। এছাড়া ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, বিল বাটাকরণ, আমদানি ও রপ্তানিকারককে ঋণ প্রদান, মেইল ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রব্য আদান-প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় এবং ফ্রেতা-বিক্রেতাদের সেনা-পাওনার নিশ্চিতি হয়। এসব কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



ব্যাংক কার্যক্রমে প্রযুক্তি

৫) অর্থ স্থানান্তর

গ্রাহকদের প্রয়োজনে ব্যাংক এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ প্রেরণ করে। অর্থ প্রেরণের মাধ্যম হলো চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, মেইল ট্রান্সফার ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি।

৬) রেমিট্যান্স

বিদেশে কর্মরত সকল জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে এবং দেশীয় সংশ্লিষ্ট মালিককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তান্তর করে বাণিজ্যিক ব্যাংক যথাযথ সেবা প্রদান করে।

৭) সঞ্চয় বৃদ্ধি

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। ব্যাংক সঞ্চয়িত অর্থ ব্যবসায় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

এ ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে-

- (ক) জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, যেমন- দলিলপত্রাদি ও মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে।
- (খ) বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেন্ডার ও সরকারি বণ্ড ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে।
- (গ) সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক অধির দায়িত্ব পালন করে।
- (ঘ) গ্রাহকদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে।
- (ঙ) গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, বাড়িভাড়া, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে।

উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ : বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে? ব্যাখ্যা কর।

৭.৪ ব্যাংক হিসাব খোলার ও পরিচালনার নিয়ম

সুজন তার অর্জিত আয়ের একটি অংশ ব্যাংকে জমা রাখার জন্য তার উপজেলা সদরে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখা অফিসে যায়। সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা মাসুদ সাহেব তাকে হিসাব খোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মাসুদ সাহেব প্রথমে সুজনকে তিন ধরনের যেমন- (১) চলতি হিসাব, (২) সঞ্চয়ী হিসাব ও (৩) স্থায়ী হিসাবের ধারণা দেন। তিনি বলেন সব ধরনের হিসাব খোলার নিয়ম মোটামুটিভাবে এক। আমাদের দেশের সব ব্যাংকে হিসাব খোলার নিয়মাবলি প্রায় একই ধরনের। সুজন সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে প্রথমে ব্যাংকের শাখা অফিস থেকে একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী তাকে (আবেদনকারীকে) শনাক্ত করার জন্য আবেদনপত্রে সায়েমের তথ্যসহ স্বাক্ষর নিতে হয়। কেননা সায়েমের উক্ত ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। সায়েমকে শনাক্ত প্রদানকারী বা পরিচয়দানকারী বলে। এছাড়া আবেদনপত্রে সুজন স্বীকে নমিনী করে তার তথ্যও লিপিবদ্ধ করে (নমিনী বলতে বোঝায় ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ আমানতকারীর অবর্তমানে/মৃত্যুর পর তার মনোনীত যে বা যারা জমাকৃত অর্থের অধিকারী হবে)।

সুজনের মতো সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো ব্যাংকে যেকোনো ধরনের হিসাব খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ জমাদান করতে এবং ওঠাতে পারে।

কাজ : ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

[illegible][illegible]

৭.৫ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রা বাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তাই এর প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয় বরং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি স্বাধীন দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। যেমন : বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, ইংল্যান্ডের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড।



ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড ভবন



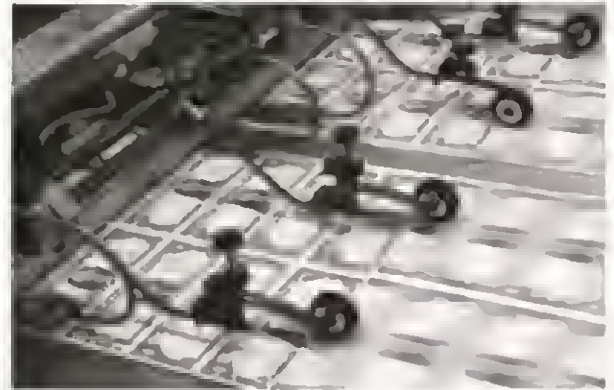
ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ভবন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

প্রত্যেক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ও মুদ্রাবাজারের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

১) নোট ও মুদ্রা প্রচলন

কোনো দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে। এ ব্যাংক দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করে। অতীতে দেশে নোট প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আইন অনুযায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে হতো। বর্তমানে দেশে অর্থের যোগান ও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির উপর নির্ভরশীল।



কাগজি নোট ছাপানো

২) সরকারের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব পাওনা সরকারের হিসাবে জমা করে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে। আর্থিক সংকটের সময় সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করে। তার অধীনস্থ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে। আইন বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখতে হয়। এ গচ্ছিত তহবিল হতে প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

৪) ঋণ নিয়ন্ত্রণ

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কেননা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে ঋণ দেয় তা মোট অর্থের যোগানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় যা দামস্তর এবং অর্থের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঋণের আধিক্যের জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি এবং ঋণের স্বল্পতার জন্য দেশে মুদ্রা সংকোচন যেন দেখা না দেয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে।

৫) সর্বশেষ ঋণদাতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কখনও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে বাধ্য হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটাপন্ন ব্যাংকসমূহের নির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে ও বিভিন্ন ঋণপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬) বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, টাকার বিপরীতে ডলার, ইউরো ইত্যাদির বিনিময় হার নির্ধারণ। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

৭) নিকাশ ঘর

দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাকট ও পেঅর্ডার আদান-প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার বা দেনাদার হয়। কোনো ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কত পাওনা বা কত সেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংরক্ষণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে অর্থ বা তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে তা থেকে এরকম সেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে। এভাবে এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।



বদলজির নিকাশঘর

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে-

- (ক) তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- (খ) অধিভূত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা সময়ান্তরে যাচাই করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

- (গ) জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি ও বাস্তবায়ন করে।
- (ঘ) দেশে-বিদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখা স্থাপনে সহায়তা করে।
- (ঙ) দেশবাসীর অবগতির জন্য এবং সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করে এবং গবেষণার কাজ পরিচালনা করে।
- (চ) অর্থনীতির বিভিন্ন খাত, যেমন- কৃষি, শিল্প, সেবা (ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য) খাতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে।

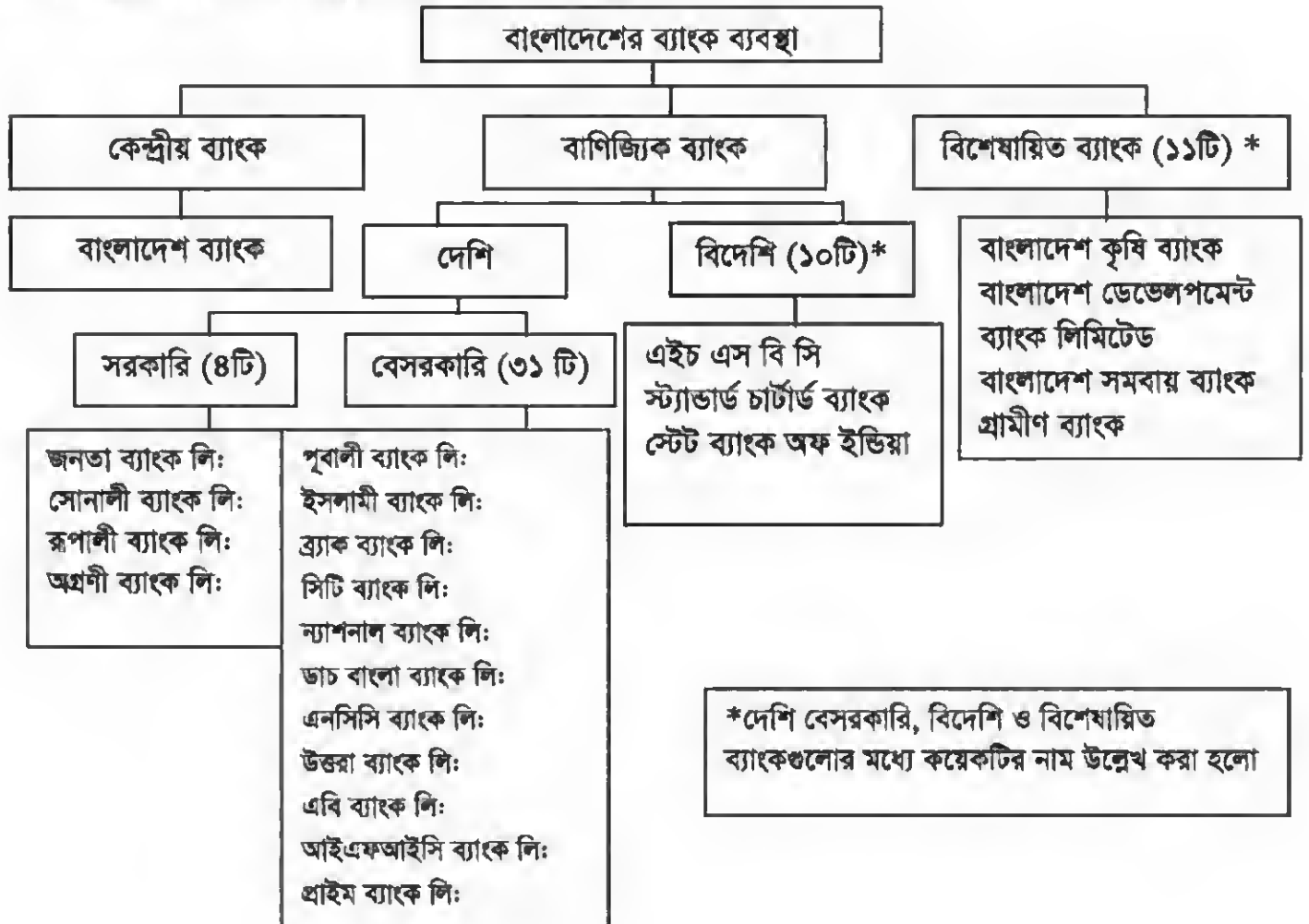
উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে- ব্যাখ্যা কর।

৭.৬ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

আমাদের দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর জনসাধারণের আমানত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। অন্যদিকে বিশেষ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিশেষায়িত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার চার্ট অঙ্কন করা হলো :



৭.৭ কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা
বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য করেকটি ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হলো-

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির “বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২” এর বলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে স্থিতিশীল মূল্যস্তর বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান তথা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে এ ব্যাংক নিয়োজিতভাবে ভূমিকা পালন করে :



মনোগ্রাম (বাংলাদেশ ব্যাংক)

দেশের কৃষি খাতে প্রয়োজনমায়িক কৃষিঋণ সরবরাহে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদারভাবে ঋণ তহবিল প্রদান করে। এ ছাড়া কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা ও কৃষি পরিসংখ্যান তৈরি করে এ ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে।

দেশের দ্রুত শিল্পায়নের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প মূলধন সরবরাহকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ তহবিল সরবরাহ করে। শিল্প উদ্যোক্তা হোপি-বিকাশে উদ্বুদ্ধকরণ ঋণ সহায়তা করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণপত্রের বিনিময়ে ঋণ প্রদান, নতুন ব্যাংক স্থাপন এবং অনুন্নত এলাকার বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপন করে, ঋণের যোগান নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ব্যাংক নিম্ন উদ্যোগে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

কাজ : অর্থব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক- ব্যাখ্যা কর।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি ও বেসরকারি এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-



কৃষি ও শিল্প খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ফলে কৃষি উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। এ দেশের অধিকাংশ কৃষক গরীব। তাই তাদের কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য দরকার পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের। বর্তমানে কৃষি উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে সরকার ঘোষিত কৃষি ঋণদান কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ত্রয়, পানি সেচের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন এবং কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের কৃষক মাত্র ১০ টাকা জমা রেখে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পাচ্ছে। এতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সকল কৃষকের ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। তা থেকে ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা দান করে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ত্রয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। বর্তমানে এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিক্সা ও ড্যান ত্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-গম ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। এর ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কাজ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক- ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও আধা-স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। নিম্নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষির সাথে জড়িত খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

ক. আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। তাই কৃষকের ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য (যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি ত্রয় এবং জমি চাষ, ফসল নিড়ানো, ফসল কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য) এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

খ. জমি সমতল করা, অগভীর নলকূপ স্থাপন, চাষের জন্য গবাদি পশু এবং হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ত্রয় করা প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক কৃষককে মধ্যম মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

গ. জমি ও ভারী যন্ত্রপাতি (যেমন- ট্রাক্টর, হারভেস্টার ইত্যাদি) ত্রয়, গভীর নলকূপ স্থাপন, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, পানি সেচের উদ্দেশ্যে খাল খনন, চা বাগানের উন্নয়ন এসব কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ ৫ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

এ ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকাকার চাষ, মৎস্য খামার তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে, যা নিয়ে আমাদের বেকার যুবকরা তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

কাজ : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে সরকার ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে Vendors Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠান দুটির দায়, সম্পদ ও জনবল নতুন প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পিত হয়েছে। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক সাধারণত আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করে, যেমন- পাট শিল্প, চামড়া শিল্প, চিনি শিল্প ও সার শিল্প ইত্যাদি। পল্লী এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।

এই ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি ঋণে নতুন শিল্প নির্মাণ, পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এই ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। শিল্প কারখানার প্রয়োজনে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণও প্রদান করে। উদ্যোক্তাকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদান এবং শিল্পায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার গবেষণা, পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

শ্রমির্ভরতা অর্জন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মেয়াদি ঋণ প্রদান করছে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। বেসরকারিভাবে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দান ও শিল্প কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করে।

কাজ : উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর ভূমিকা লিখ।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। জনসাধারণকে উৎপাদন কার্যকলাপে এ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করে। কৃষি ঋণের উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক শাকসবজি চাষ, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও জমি চাষাবাদ ইত্যাদি ঋণে ঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করায় কৃষক গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে কঠিন শর্তে ও চড়া সুদে ঋণ নিতে হয় না।

দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে শিল্প খাতে সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে (যেমন- বাঁশ ও বেড়ের কাজ, বিড়ি তৈরি, সাবান তৈরি, কাপড় তৈরি ও মিষ্টি তৈরি) ঋণ প্রদান সহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। গ্রামীণ ফোনের কারিগরি সহায়তায় গ্রামের সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য পল্লীফোন চালু করে।

সুবিধাবঞ্চিত বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যাংক হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এ ব্যাংক ভিক্ষুককে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে। নারীকে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে এ ব্যাংক সহায়তা করে। দরিদ্র অসহায় মহিলাদের ঋণ হিসেবে পল্লীফোন প্রদান করা হয়। এর আর থেকে ঋণ পরিশোধ করে মহিলাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়।



গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

কাজ : সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অনন্য ব্যাখ্যা কর।

সমবায় ব্যাংক

সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করাই সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। সরকার ও দেশের সমবায়ীর যৌথ মালিকানায় পরিচালিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির শেয়ারের ৮৬% মালিক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ১৪% সরকারের মালিকানার। নিম্নে সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিকণ প্রদান করে। ঋণ প্রদানের খাতগুলো হলো- কৃষি, ভূমি উন্নয়ন, আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষ, শীতকালীন ফসল ও শাকসবজি উৎপাদন, বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক, সেচযন্ত্র ও ট্রাক্টর ইত্যাদি। কৃষি ঋণের মেয়াদ তিন ধরনের হয়, যেমন : স্বল্পকালীন- ৬ মাসের জন্য, মধ্যম মেয়াদি- ২ বছরের জন্য এবং দীর্ঘকালীন- ৫ বছরের জন্য প্রদান করে।

সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহে এবং নির্মাণ শিল্পে এ ব্যাংক অর্থায়ন করে।

এ ব্যাংক গ্রামীণ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের অংশীদার সমবায় ব্যাংক। এছাড়া দেশের আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়, যেমন- মাছ চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। যার ফলে দেশের বেকারত্ব লাঘবের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কাজ : সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৪. দেশের অর্থনীতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান হচ্ছে-

- i. পুঁজি গঠন করা
- ii. মুদ্রার মান সংরক্ষণ
- iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও ii
- গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রত্না একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার প্রতিষ্ঠান জনগণকে ঋণ দিতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে তার বান্ধবীও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এটি জনগণের সম্বন্ধিত অর্থ জমা রাখে এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

- ক. বিনিময় প্রথা কী?
- খ. সম্বন্ধের বাহন হিসেবে অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
- গ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বান্ধবীর প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. হাবুনের স্ত্রীর একটি শাড়ির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তার কাছে একটি ছাগল ছাড়া কিছুই নেই। হাবুন তার ছাগল নিয়ে তাঁতির কাছে গেলে তাঁতি একটি শাড়ির বদলে ছাগল নিতে চায়। কিন্তু হাবুন একটি শাড়ির বদলে ছাগলটি দিতে রাজি হয়নি। পরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অসুবিধা দূর হয়।

- ক. বিহিত অর্থ কাকে বলে?
- খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?
- গ. হাবুন তাঁতির কাছে গিয়ে শাড়ি কিনতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সবার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্রব্যটির ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি

The Economy of Bangladesh

রতন একজন ধনী কৃষক। গত কয়েক বছর ধরে তার জমিতে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। পারিবারিক ব্যয় বহন করার পর উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত অর্থ রতন সঞ্চয় করে। গত বছর রতন একটি ছোট তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করে যা তার স্ত্রী জয়ন্তী পরিচালনা করে। সেখানে তার গ্রামের নারী শ্রমিকেরা কাজ করে। তারা তাদের একমাত্র ছেলে রনীকে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করে। রনী অসুস্থ হলে তাকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি আংশিক চিত্র ফুটে ওঠে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারব
- অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) বর্ণনা করতে পারব
- দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতের (কৃষি, শিল্প ও সেবা) তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করতে পারব
- খাতভিত্তিক অর্থনীতির তথ্য উপাত্ত ব্যাখ্যা এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারব
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান চিত্র অংকন করে প্রদর্শন করতে পারব

৮.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bangladesh Economy)

প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শোষণ ও চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। উপরন্তু ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর চার দশক ধরে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এখনও একটি স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ করা যায় :

১) কৃষি খাতের প্রাধান্য

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিক্ষেত্রের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। ক্রমান্বয়ে এই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ সুবিধা বাড়ছে। সংগে সংগে উৎপাদনও বাড়ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (ফসল, মৎস্য সম্পদ, গবাদিসম্পদ ও বনজ সম্পদ) অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ হয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এম ই এস, ২০১০, বিবিএস)।



কৃষিকাজ

২) শিল্পায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। তাই এ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বাড়াতে আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো- কর্মসংস্থান বাড়ানো, শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কমানো। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচী হলো- বিনিয়োগে বাধা কমানো, কর মুক্ত করা, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং



কারখানার কর্মরত শ্রমিক

শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন। এসব কর্মসূচির সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতের অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। মোট শ্রমশক্তির ১৭.৬৪ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত (এমপ্লয়মেন্ট সার্ভে-২০১০)।

৩) মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি

এ দেশে কৃষি ও শিল্পের স্বল্প উৎপাদন, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকায় মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৩১৪ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জিডিপি ১২৩৫ মার্কিন ডলার। তবে আমাদের মাথাপিছু আয় ধীরগতিতে হলেও বাড়ছে।

৪) জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি

স্বল্প আয়ের জন্য আমাদের দেশের প্রায় ৩১.৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করে। ধীরগতিতে হলেও জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়ার মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৬৯ বছর। সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৮৭.৫৫ শতাংশ এবং সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) ৫৭.৯ শতাংশ।

৫) বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি

আমাদের মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় ক্ষমতা কম। তাই বিনিয়োগ বা পুঁজি গঠনের হারও কম। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক উদ্দীপনামূলক ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করেছে। এর ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২৮.৯৭ শতাংশ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যা আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

৬) খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অধিক জনসংখ্যার কারণে এদেশে বহুদিন ধরে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা লক্ষ করা যায়। তাই সরকার বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত বীজ, সার এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশে মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%, যা ২০০১ সালে ছিল ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পেলেও সময়তনের দিক দিয়ে অনেক ছোট এই দেশটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে নবম বৃহত্তম দেশ।

৮) ব্যাপক বেকারত্ব

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে এ দেশে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা যায়।



ঢাকা ইন্সটিটিউট

তবে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (EPZ: Export Processing Zone) বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্যে বিভিন্ন উদ্বীপনামূলক ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করায় বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু হচ্ছে যার ফলে বেকার সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে কমে যাবে বলে আশা করা যায়। (দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ২৫ লক্ষ লোক বেকার)।

৯) প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবকাঠামোগত উপাদান। বর্তমানে এসব সম্পদের আবিষ্কার ও ব্যবহার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ খাতের সমন্বিত অবদান স্থির মূল্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১.৬৩ শতাংশ হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা



কয়লা খনি

প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। আমাদের দেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত ২৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৮৩টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের (রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জ) মোট মজুদ প্রায় ২৭০০ মিলিয়ন টন। উত্তোলিত কয়লার ৬৫ ভাগ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এদের মধ্যে পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থানক্ষেত্রে উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

১০) বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বহুমুখী চাহিদা পূরণ এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের ভোগ্যপণ্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা আমাদের রপ্তানি আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এজন্য বাণিজ্যের ভারসাম্যে অব্যাহত ঘাটতি দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

১১) বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা যায় না। তাই বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে আশার কথা হলো বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার হার হ্রাস পাচ্ছে। কেননা এসব সাহায্যের অপরিপািততা, অনিশ্চয়তা ও সময় ক্ষেপণের দরুণ আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়ছে যা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং প্রযুক্তিমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ভর্তুকিপূর্ণ সূক্ষ্মীকরণ পালন করে। সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের উদ্যোগযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে গম্বা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন কেবলেজ মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামো যেমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও সূচ্যবোধ প্রভৃতি ভর্তুকিপূর্ণ সূক্ষ্মীকরণ পালন করে। বর্তমান সরকার শিক্ষার ভগ্নগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন খাত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।



এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

১৩) বেসরকারিকরণ কর্মসূচি

আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্থে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আওতার বেসরকারি খাতের উন্নয়নের উপর সার্বিক ভর্তুকি আরওণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯০ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৭৭ টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রকল্পের বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৬টি প্রকল্পের সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রকল্প/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

১৪) পরিকল্পনা গ্রহণ

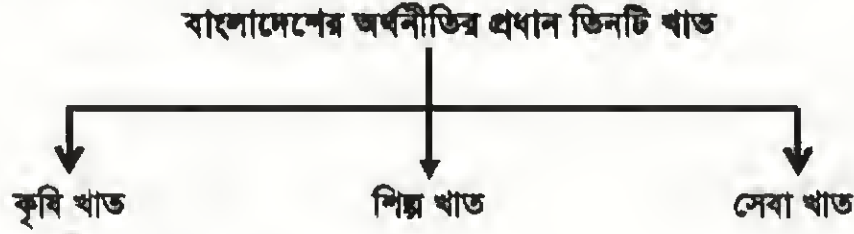
আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন, এবং সম্পদের সুব্যবহার ও ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সাহসে রেখে জুলাই ২০২১ এর আলোকে “বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপরেখা (২০১০-২০২১)” শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রযুক্তি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক ও উদ্যোক্তা প্রেশি তৈরি হচ্ছে। বারো স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে সূক্ষ্মীকরণ পালন করা হচ্ছে।

কাজ : বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে, আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

৮.২ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (Main Sectors of Bangladesh Economy)

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে এবং এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির তিস্তি গড়ে ওঠে। অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত এসব শাখা বা বিভাগকে অর্থনৈতিক খাত বলে।



কৃষি খাত (Agriculture Sector)

কৃষি হচ্ছে একরূপ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাহ ও মৌমাছি চাষ, গুপ্পালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত।



মৎস্য চাষ



গুপ্পালন



সুন্দরবন

নিম্নে কৃষি খাতের উপখাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

শস্য ও শাকসবজি

আমাদের দেশের কৃষকেরা শস্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, ডাল, আখ, তামাক, চা, তৈলবীজ ইত্যাদি আর শাকসবজির মধ্যে আলু, সীম, লাউ, মটরশুঁটি, পটল, কুমড়া, বেগুন ইত্যাদি উৎপাদন করে।

প্রাণিসম্পদ

আমাদের দেশে পারিবারিকভাবে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, কবুতর ও অন্যান্য পাখি পালন করা হয়। এদের মাংস, ডিম, দুধ, পালক ও চামড়া ইত্যাদি এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

মৎস্য সম্পদ

এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হাওর ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাহ ও মৎস্যজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন- মিঠা পানির মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। মিঠা পানির মৎস্য হলো রুই, চিতল, কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি এবং সামুদ্রিক মৎস্য হলো, রূপচাঁদা, ভেটকী, লইট্যা ইত্যাদি।

বনজ সম্পদ

আমাদের দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১৭ ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল, যেখানে একটি দেশের থাকা উচিত মোট ভূখণ্ডের ২৫ ভাগ। এসব বনাঞ্চলে রয়েছে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন, গর্জন, সুন্দরী, গরান, গেওয়া, গামারি, কড়াই, কুচি ও কেওড়া ইত্যাদি গাছ। এগুলো থেকে কাঠ, রাবার, গাম-তৈল, শণ, মোম ও মধু ইত্যাদি আমরা পেয়ে থাকি।

নিচের তালিকায় বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদানের হার উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
১. কৃষি ও বনজ	১৩.০৯	১২.৮১
ক. শস্য ও শাকসবজি	৯.৪৯	৯.২৮
খ. প্রাণি সম্পদ	১.৮৪	১.৭৮
গ. বনজ সম্পদ	১.৭৬	১.৭৪
২. মৎস্য সম্পদ	৩.৬৮	৩.৬৯

অতএব, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৩.৭০ শতাংশ এবং ১৩.০৯ শতাংশ। কৃষি খাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন : হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা। আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
১. কৃষি ও বনজ	১.৪৭	৩.৮১
ক. শস্য ও শাকসবজি	০.৫৯	৩.৭৮
খ. প্রাণি সম্পদ	২.৭৪	২.৮৩
গ. বনজ সম্পদ	৫.০৪	৫.০১
২. মৎস্য সম্পদ	৬.১৮	৬.৩৬

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণ পৌঁছানো, সহজ পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ প্রদান, কৃষিবীমার প্রচলন ও কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি থেকে প্রাপ্ত শণ, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এ দেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়া জনগণের প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাঙ্ক্ষা : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম ব্যাখ্যা কর।

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫, ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬

শিল্প খাত (Industry Sector)

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রযুক্ত প্রণালীর মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

বাংলাদেশের জাতীয় আর নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।



গ্যাসক্ষেত্র



একটি বিদেশি মেট্রো রেলওয়ে



জাহাজ শিল্প

শিল্পখাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো :

১) খনিজ ও খনন

এ খাতের প্রধান উপখাত হলো-

- ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিিশোধিত তৈল
- খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন (কয়লা, চুনাপাথর, চীনা মাটি, গন্ধক, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু ও তামা ইত্যাদি)

২) শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)

ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প নিম্নে আলাদাভাবে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উল্লেখ করা হলো :

বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পাট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। দেশের উল্লেখযোগ্য মাঝারি শিল্প হলো, চামড়া শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, সিগারেট শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প ইত্যাদি।

খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : নিম্নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ২ ভাগে উল্লেখ করা হলো :

ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঠ শিল্প, সাবান শিল্প, প্রসাধনী শিল্প এবং যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্প।

রেশম শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প এবং তাঁত শিল্প ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।

৩) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি এ খাতের উপখাত ৩টি হলো- ক. বিদ্যুৎ, খ. গ্যাস ও গ. পানি

৪) নির্মাণ শিল্প এই খাতে অন্তর্ভুক্ত - সেতু নির্মাণ, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ঘর-বাড়ি নির্মাণ।

উপর্যুক্ত চারটি খাতের সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গঠিত।

২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২৯ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ২৯.৬১ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

নিচের তালিকায় মোট দেশজ উৎপাদে সার্বিক শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
১. খনিজ ও খনন	৯.৩৫	৪.৬৮
২. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১০.৩১	৮.৭৭
৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	৮.৯৯	৪.৫৪
৪. নির্মাণ	৮.০৪	৮.০৮

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ৮টি EPZ [চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী] এ ৪১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে; ৩,৫০,২৬৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক সেখানে কর্মরত এবং ৪,২১০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে সরকার শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা,

দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানো। উন্নয়ন রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অবদান হবে ৪০ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানে অবদান হবে ২৫ শতাংশ।

কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহস্থালী, সেবা খাতসমূহ বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই সরকার এ খাতে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১০-১৬ সাল নাগাদ ১৪,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার ব্যাপারে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। রাসায়নিক সার তৈরির কাঁচামাল রূপে, কলকারখানা, পরিবহন ও গৃহে গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



সিমেন্ট, কাগজ, সারান, ব্লিচিং পাউডার উৎপাদনে চূনাপাথর; বাসনপত্র ও স্যানিটারী দ্রব্য তৈরিতে চীনাখাটি; কাঁচ ও সামান্যিক দ্রব্য তৈরিতে সিলিকা বালু; বাসন ও নিরাপত্তাই কারখানার এবং তেল পরিশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সার্বিক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনমানের মান উন্নয়ন, বাসিষ্ঠ্য স্বাধীনতা দূর করার পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব।

কাজ : সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব - ব্যাখ্যা কর।

সেবা খাত (Service Sector)

অর্থনৈতিক বেসব কাজের মাধ্যমে অবসরপন্ন দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ সৃষ্টমান মূল্য বা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং তার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে।



আর্থিক প্রতিষ্ঠান



পরিবহন ব্যবস্থা

বালোসেলে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্টোরাঁ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বোলাবোন, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ন, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। এসব সেবা অর্ধের বিনিময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ এসব সেবা গ্রহণ করে তাদের অভাব পূরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সেবা খাত হলো একক বৃহত্তম খাত। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান সাক্ষরিত ৫৪ শতাংশ।

সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহের জিডিপি তে অবদানের হার নিচের তালিকায় দেখানো হলো :

খাত	২০১২-১৩
১. পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.০৩
২. হোটেল ও রেস্টোরাঁ	০.৭৫
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও বোলাবোন	১১.৫০
৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক খাত	৩.৩০
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বিমা	৭.০৭
৬. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৩৬
৭. শিক্ষা	২.২৪
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১.৮৮
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০.০৯

উৎস : বালোসেল অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে অবদান সর্বোচ্চ আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত হলো পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাত যার উপখাত হলো-

ক) স্থলপথ পরিবহন

যার আওতায় সড়কপথ ও রেলপথ রয়েছে। সড়কপথের মধ্যে ২০১২ সাল অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৩৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক সড়ক ৪৩২৩ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩৬৭৮ কিলোমিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৮৭০ কিলোমিটার (ব্রডগেজ ৬৫৯ কি.মি, ডুয়েল গেজ ৩৭৫ কি.মি এবং মিটার গেজ ১,৮৪৩ কি.মি.)।

খ) পানিপথ পরিবহন

আমাদের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মহলা। আর অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশনের ১৮৮টি জলযান দ্বারা ফেরী সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিক সেবা অব্যাহত রেখেছে।

গ) আকাশপথ পরিবহন

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর পরিচালনা করছে। এ ছাড়া ২টি স্টল পোস্ট ব্যবহার উপযোগী রয়েছে (STOL – Short Take off and Landing)।

ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০২ সালে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পর গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ ২০১১ এ গ্রাহক সংখ্যা ৫.৪৭ কোটি অতিক্রম করেছে।

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ উপখাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৯.৬৭ শতাংশ।

মোট দেশজ উৎপাদে সার্বিক সেবা খাতের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় দেওয়া হলো :

খাত	২০১১-১২	২০১২-১৩
১.পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.৭০	৬.১৮
২. হোটেল ও রেস্টোরা	৬.৩৯	৬.৪৯
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯.১৫	৬.২৭
৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক খাত	১৪.৭৬	৯.১১
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বীমা	৩.৯২	৪.০৪
৬. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭.৫৩	৬.৫৩
৭. শিক্ষা	৭.৭৫	৬.৩০
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৩.৮১	৪.৭৬
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.২৫	৩.২৫

এ খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, উপকরণের গতিশীলতা আনয়নে সর্বোপরি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে সার্বিক সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কাজ : বাংলাদেশের সেবা খাতের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর।

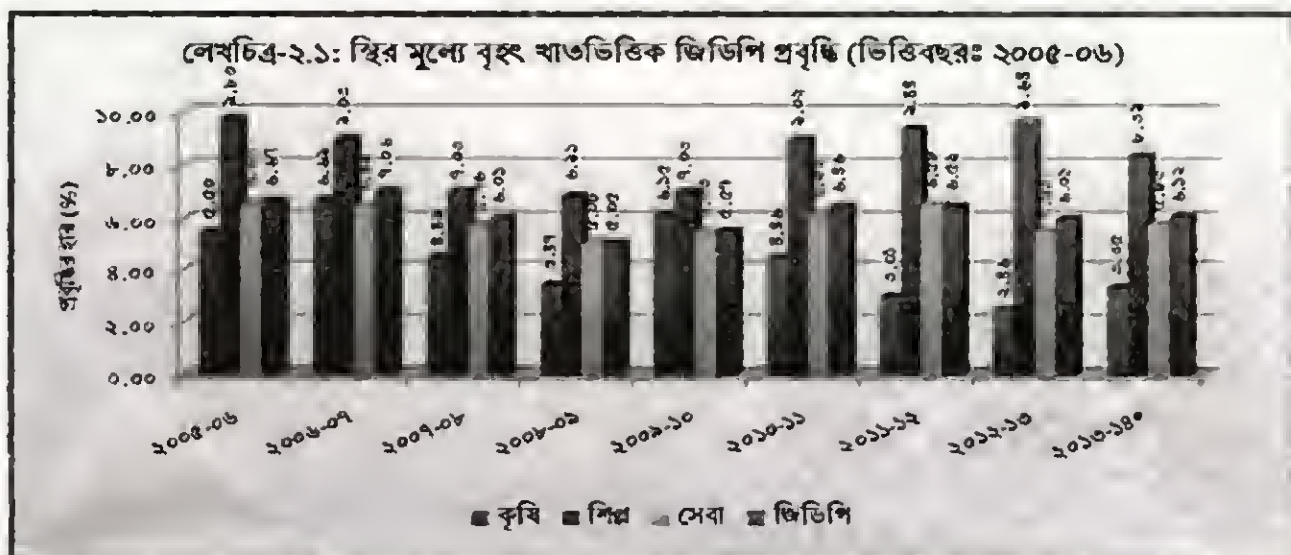
৮.৩ বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

উৎপাদন ভিত্তিতে নিম্নলিখিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা এ তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এ দেশে প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবা খাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদগড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন পর্যাণ্ড ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিক্ষেত্রের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও সবশাস্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি সত্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো খাতই মোটামুটি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃদ্ধিও সত্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

নিচের লেখচিত্রের বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হলো :



আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপিতে) গত তিন দশকে কৃষি খাতের অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদানে প্রায় একই রয়েছে।

কাজ : স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান প্রদর্শন কর।

৮.৪ কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

রমিজ একজন ধনী কৃষক। তিনি জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করেন, গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজনীয় জৈব সার ব্যবহার করে অধিক ধান উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ধান পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি বস্ত্রায় করে বাজারে সরবরাহ করেন। অনেকেই তাদের খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য ক্রয় করেন।

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা বলতে পারি কৃষি খাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয় শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষি খাত।



কৃষিনির্ভর শিল্প (চিনি শিল্প)



শিল্পনির্ভর কৃষি

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিচে আলোচনা করা হলো :

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এ দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন- পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে যেসব অঞ্চলে আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটে, যেমন- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাট শিল্প; চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনি শিল্প পড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনবাজার মান উন্নত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প ক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য দুটি খাতের একই সঙ্গে উন্নতি একান্তভাবে কাম্য।

কাজ : কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?
২. কৃষিখাতের উপখাতসমূহ কী কী?
৩. কৃষিখাতের উপখাতসমূহের উদাহরণভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।
২. বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৩. কৃষিখাত ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের শ্রম শক্তির কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত?
ক. ১৯.৯২% খ. ৩০.৩০%
গ. ৪৩.৬০% ঘ. ৪৭.৫০%
২. বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য হলো-
i. মাথাপিছু আয়ের হার বৃদ্ধি
ii. শিল্পক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগামী করা
iii. কর্মের পরিমাণ বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মতি তার পরিবার নিয়ে অজপাড়াগায়ে বসবাস করে। সেখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস কিছুই নেই। পরিবারের সকলে মিলে চৌস্তা তৈরি করে কোনোরকম জীবন যাপন করে।

৩. মতিদের কর্মকাণ্ড কোন শিল্পের অন্তর্গত?

- ক. বৃহৎ খ. মাঝারি
গ. ক্ষুদ্র ঘ. কুটির

৪. মতিদের মতো উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে-

- সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে
- বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে হবে
- প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্থনীতির দুটি খাত



A (কৃষক মাঠে পাট কাটছে)



B (পাটের তৈরি ব্যাগ)

ক. শিল্প কী?

খ. আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম কেন?

গ. 'A' খাতের উন্নয়নের উপর কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'A' ও 'B' খাত পরস্পর পরিপূরক- মূল্যায়ন কর।

২.



ক. সেবা কাকে বলে?

খ. ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি কৃষি- ব্যাখ্যা কর।

গ. EPZ কর্তৃপক্ষের 'A' চিহ্নিত স্থানকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের GDP তে 'A' স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অবদান মূল্যায়ন কর।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

Important Economic Issues in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে (যেমন— কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য) উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক খাতসমূহের সম্প্রসারণ করে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।
- বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি এবং এর নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মানবসম্পদের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- জনসংখ্যা কীভাবে দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন (Economic Growth and Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারণা দুটি এক মনে হলেও আসলে এক নয়। এই শব্দ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন একটি চলমান গতিধারাকে বুঝায় যা কতগুলো শক্তির সংযোগ, যার ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। শক্তিসমূহ হচ্ছে, উৎপাদন, জাতীয় আয়, ভোগ, বিনিয়োগ, নিয়োগ, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি প্রভৃতি।

অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে বুঝতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এ জন্য লেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

কাজ : প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

৯.২ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed, Least Developed and Developing Countries)

উন্নত দেশ: অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে। এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

অনুন্নত দেশ: অধ্যাপক র্যাগনার নার্কস বলেন, অনুন্নত দেশ হচ্ছে সেইসব দেশ সেগুলোতে জনসংযোগ ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় মূলধন বা পুঁজি কম। এসব দেশে জনসাধারণ নিম্নমানের জীবন যাপন করে।

উন্নয়নশীল দেশ: যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে।

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য প্রায় এক রকম হলেও ধারণাগত দিক থেকে এদের ভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৯.২.১ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed Countries)

উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ :** উন্নত দেশ পর্যাণ্ড প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এসব দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ হয়। উন্নত দেশ যেমন, আমেরিকা, জাপান, ইউরোপের দেশগুলো ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণ করে আজ উন্নত বিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে।
২. **মূলধন:** উন্নত দেশে মূলধনের যোগান পর্যাণ্ড। অর্থনীতিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়।

৩. **দক্ষ জনশক্তি** : যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ইত্যাদি পর্যাপ্ত থাকলেও যদি দক্ষ জনশক্তি না থাকে তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। উন্নত দেশ দক্ষ জনশক্তি গঠনে বিশেষ নজর রাখে। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।
৪. **উচ্চগড় আয়ুষ্কাল** : উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ু সাধারণত বেশি হয়। উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে তাদের গড় আয়ু বেশি হয়ে থাকে।
৫. **কারিগরি জ্ঞান** : বর্তমানে উন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির মূলে রয়েছে কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি। যে দেশ কারিগরি জ্ঞানে যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উন্নত দেশে মানুষ উন্নত কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশে এনেছে এবং এই প্রকৃতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছে।
৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা** : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই সে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।
৭. **উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা** : যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেখানে তত বেশি উৎপাদন ও উন্নয়ন হয়। কারণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কাজ : উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Least Developed Countries)

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অনুন্নত। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক এসব অনুন্নত দেশে বসবাস করে। অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. **কম উৎপাদনশীল কৃষিখাত** : অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত ও কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি সনাতনী।
২. **কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি** : এসব দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে।
৩. **বেকারত্ব** : অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ায় ছয়বেশী ও মৌসুমী বেকারত্ব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।
৪. **কম মাথাপিছু আয়** : অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়।
৫. **দারিদ্র্যের দুইচক্র** : অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুইচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।
৬. **জনসংখ্যাধিক্য** : বেশির ভাগ অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় কম। জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, যানবাহন, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে করা যায় না।

৭. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার : অনুন্নত দেশ প্রযুক্তি ও কৌশল পরিবর্তন করে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেগবান হয় না।
৮. অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা : অনুন্নত দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকে। ফলে মালামাল স্থানান্তরে বিঘ্ন ঘটে। উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না।
৯. প্রতিকূল বাণিজ্যশর্ত : অনুন্নত দেশগুলো শিল্পে উন্নত না থাকায় এসব দেশ কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল, প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। যেসব কৃষিপণ্য উপকরণ হিসাবে কম মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করে, সেই কৃষিপণ্য শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে অধিক মূল্যে এসব দেশে আমদানি করা হয়। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে।
১০. অনুন্নত শিল্প কাঠামো : অনুন্নত দেশে শিল্প কাঠামো সেকেলে এবং বৃহদায়তন মূলধনী শিল্প খুব কম। অনুন্নত শিল্প কাঠামোতে শ্রমিক নিয়োগ কম এবং শ্রমিকদের দক্ষতাও কম।

কাজ : উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত দেশের তুলনা কর।

উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developing Countries)

উন্নয়নশীল দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

১. কৃষি নির্ভর অর্থনীতি : দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। কৃষিক্ষেত্রে পুরনো আমলের জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারে চাষাবাদ হয়। কৃষিতে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব লেগেই থাকে।
২. মাথাপিছু আয় : উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয়।
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার : অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না।
৪. মূলধনের স্বল্পতা : উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। কম সঞ্চয় মূলধন গঠনের পথে অন্তরায়।
৫. প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ : উন্নয়নশীল দেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক পণ্য বলতে শিল্পের কাঁচামাল যেমন, পাট, চামড়া ইত্যাদি বোঝায়।
৬. শিল্পের বিকাশ : উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্প প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। এ সকল দেশে শিল্প ধীরগতিতে বিকশিত হয়।
৭. বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি : উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বছর রপ্তানির মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় আসে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানির মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে এ দেশকে প্রতি বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।

৮. উদ্যোক্তার অভাব : উন্নয়নশীল দেশে পণ্যসামগ্রী বেশির ভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত। এসব পণ্যের মূল্যের উত্থান-পতন হয় বেশি। পণ্যের মূল্য উত্থান-পতন হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
৯. অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল : উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহন, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় কম।
১০. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা : উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায় পুরোটাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

কাজ : বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের, নির্ধারণ কর।

৯.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ (Obstacles to Economic Development of Bangladesh)

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না।

১. কৃষির উপর নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মধুর।
২. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা : বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। কৃষি পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল।
৩. মূলধনের অভাব : বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম থাকায় সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না।
৪. উদ্যোক্তার অভাব : উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সক্ষম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তার অভাবের কারণে প্রাপ্ত সঞ্চয় ও মূলধন উৎপাদনী স্বাভাবিক কমে ব্যবহার হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ না থাকার কারণে উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে না।
৫. অধিক জনসংখ্যা : বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় হয় বিধায় উন্নয়নে বাধা হিসাবে কাজ করছে।
৬. দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্র : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্র। অধ্যাপক নার্কস-এর মতে, একটি দেশ গরিব কারণ সে দেশ দরিদ্র। দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্র হলো উৎপাদন কম, আয় কম চাহিদা ও সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম ও মূলধন গঠন কম।
৭. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতা রয়েছে। এ অবস্থা অধিকতর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও এতে ব্যাহত হয়।

৮. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা ও নানা শর্তের কারণে বাংলাদেশ প্রায়শ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিদেশিদের প্রভাব আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে।
৯. বাজার দুর্বলতা : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্র বাজার দুর্বলতা বিরাজমান। সচেতনতার অভাব, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থায়নের অভাব ইত্যাদি কারণে বাজার দাম উৎপাদকের জন্য লাভজনক হয় না।
১০. প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা : উন্নত প্রযুক্তির অভাব, আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল এবং ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় না।

কাজ : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি কর।

৯.৪ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম (Development Programmes of Non-government Organisations)

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও কাজ করছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান এনজিও হচ্ছে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস ও ব্যুরো বাংলাদেশ।

১. বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) : ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংস্থাটি দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ বস্তিতে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, অতি দরিদ্র, চরবাসী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধাভোগী ৫৬,৪০,৬৮৪ জনের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৫০,৭৪,১৮১ জন।
২. স্বনির্ভর বাংলাদেশ : স্বনির্ভর বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। শুরুতে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত সেল হিসাবে কাজ করে। বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসাবে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ শুরু করে ১৯৮৫ সালে। ~~আত্মকর্মসংস্থানের~~ লক্ষ্যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক এবং পিকেএসএফের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১৬৮৯ কোটি টাকা ১৯,৬৮,৯৩৮ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায় হয়েছে ১৪০৯ কোটি টাকা।
৩. প্রশিকা : ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশ সম্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসতবাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি খাতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৫০৭০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়ে ১ কোটি ২৬ লক্ষ মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

৪. আশা : আশা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার মধ্যে আশা হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের একমাত্র সংস্থা। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আশা বাংলাদেশে ৭১,০৮৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৬৫,৩৫২ কোটি টাকা আদায় করে।
৫. শক্তি ফাউন্ডেশন : ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঝুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুস্থ মহিলাদের এ সংস্থা ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করে ৫০৭ কোটি টাকা এবং আদায় করে ৫৮১ কোটি টাকা।
৬. টিএমএসএস : ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন। এই সংগঠন মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের অশিক্ষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত এবং ০.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকরা এ সংস্থার সদস্য। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এ সংস্থা বিতরণ করে ৮৪০৮ কোটি টাকা এবং আদায় করে ৭৪৯২ কোটি টাকা।
৭. এসএসএস (সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস) : সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃštisহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারীপুরুষ ও শিশুদের দরিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।
৮. ব্যুরো বাংলাদেশ : দেশের ৪২ জেলার ২৪৫টি থানার ১১৪৯টি ইউনিয়নের ৯০২৬টি গ্রামে সংস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই গ্রামীণ স্বচ্ছ ও ঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পানি/পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দারিদ্র্য (Poverty)

দারিদ্র্য দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সুতরাং দারিদ্র্যের ধারণা, পরিমাপ, প্রবণতা এবং কীভাবে দারিদ্র্য নিরসন করা যায় সে বিষয়ে জানা দরকার।

দারিদ্র্য ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা এক কথায় বলা কঠিন। তবে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে দারিদ্র্যের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে দেশের জনগণ পরিবর্তিত পার্শ্বপরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম নয়, প্রতিকূল প্রকৃতি যেমন বন্যা, খরা, সম্পদের অপ্রতুলতা এবং সম্পদের অসম বণ্টন ও অসম উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা রাখে, এ অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে। তথ্যগত দিক থেকে যে দেশের জনগণ বেশির ভাগ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে তাদেরকে গণদারিদ্র্য গোষ্ঠী বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ ২০১০ সালের আয়-ব্যয় জরিপ মতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ এবং ২০০৫ সালের জরিপ মতে জনগোষ্ঠীর ৪০.০ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ১৯৯১-৯২ সালে দেশে দরিদ্র ছিল ৫০.১ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে এখনও বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়।

সারণি-১
ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৯৫/৯৬	২০০৫	২০১০
দারিদ্র্য	জাতীয়	৪৭.৫	৪০.৪	৩১.৫
	পল্লী	৪৭.১	৩৯.৫	৩৫.২
	শহর	৪৯.৭	৪৩.২	২১.৩
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	২৫.১	১৯.৫	১৭.৬
	পল্লী	২৪.৬	১৭.৯	২১.১
	শহর	২৭.৩	২৪.৪	৭.৭

বাংলাদেশে দারিদ্র্য গতিধারা (Poverty Trends of Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত (non-food) ভোগ্যপণ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলত বিবিএস পরিচালিত আয় ও ব্যয় জরিপ ১৯৯৫/৯৬, ২০০৫ এবং ২০১০-এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে (CBN উচ্চ দারিদ্র্য রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) দারিদ্র্যের হার ৫০.১ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে অর্থাৎ দারিদ্র্য গড় বার্ষিক ৩.৩ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। তবে দারিদ্র্যের হার পল্লি এলাকায় অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে (গড় বার্ষিক ৩.১% হারে)। অপরদিকে, শহর এলাকায় একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাস পায় গড় বার্ষিক ১.৯ শতাংশ হারে। এই সময়কালে চরম দারিদ্র্য আরও দ্রুত হারে অর্থাৎ গড় বার্ষিক ৪.৮ শতাংশ হারে হ্রাস পায়।

দারিদ্র্য নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম (Programmes Adopted for Poverty Alleviation)

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য নিরসনের আওতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে।

১. সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল। এ সমস্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৪,৮৩০.৬৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচিসমূহের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

- (ক) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);
- (খ) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);
- (গ) খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম;
- (ঘ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এবং
- (ঙ) দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন তহবিল।

ক. নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সমূহ:

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ বয়স্ক জনগণ এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা। তাদের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা চালু করেছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালু করেছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিআরডিবি'র মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষাদের জন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে। এতে করে তাঁরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূর করতে পারবে।

খ. নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম (বিশেষ):

বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিছু বিশেষ নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চালু আছে। এসিডমুক্ত ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা এবং দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা এ ধরনের কার্যক্রম।

গ. খাদ্য কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কর্মসূচি:

দারিদ্র্য নিরসনে খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিএফ কর্মসূচি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিজিডি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

ঘ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি ভাল উপায় হল আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতি গঠন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৯.৬ বেকারত্ব (Unemployment)

বেকারত্বের সংজ্ঞা (Definition of Unemployment)

কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না- এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। একজন বেকারের মধ্যে নিচের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

- (১) মজুরিভিত্তিক কোনো কাজ পায় না,
- (২) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক,
- (৩) আয় উপার্জন থেকে বঞ্চিত,
- (৪) আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

বেকারত্বের প্রকৃতি (Types of Unemployment)

১. মৌসুমি বেকারত্ব : প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে এ ধরনের বেকারত্ব হয়। যেমন ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।
২. ছয়বেশী/প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব : কৃষিক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষি কাজে নিযুক্ত এসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য বিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছয়বেশী বেকার বলে। যেমন ধরা যাক, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। সে একাই ঐ জমিতে চাষাবাস করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। এখন যদি তার দুই ছেলে বাবার সঙ্গে ঐ জমিতে চাষের কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে ঐ কৃষক একা যা উৎপাদন করত দুই ছেলের সহ উৎপাদনের পরিমাণ একই হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত দুজন লোকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। এর কারণ হলো তিনজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে নিচ্ছে। সুতরাং এই দুজন শ্রমিককে প্রচ্ছন্ন বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব হলো সেই অবস্থা যেখানে শ্রমিক আপাত দৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য।
৩. সাময়িক বেকারত্ব : পেশা পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্ব তৈরি হয় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলা হয়। যেমন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এ সময় যে ৩ মাস কর্মহীন থাকে। এ সময়কালটা সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য। আমাদের দেশে এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজ কম থাকায় উপরিউক্ত বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা দেয়।

বেকারত্ব নিরসন (Reduction of Unemployment)

বেকার সমস্যা সমাধান করতে কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, বহু ফসলী চাষাবাদ এবং কৃষিভিত্তিক নানা কাজকর্ম যেমন- গবাদি পশু পালন, বনসৃজন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অকৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, খাল সংস্কার, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, ছোট-খাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব ছাড়াও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়।

১. ছয়বেশী বেকারত্ব দূরীকরণ : অনুন্নত দেশের কৃষি ব্যবস্থায় ছয়বেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। এই বেকারত্ব নিরসন করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরির চেয়ে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি বেশি প্রদান করলে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাবে। আর কৃষিক্ষেত্রে থেকে উদ্ধৃত বেকার শ্রমিক শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তর হবে।
২. মূলধন বিনিয়োগ ও বেকারত্ব দূরীকরণ : উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব নিরসনে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ দ্বারা প্রথমে শিল্পের উন্নয়ন ও পরবর্তীতে শিল্পের যান্ত্রিক কৌশলগত উন্নয়ন করলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

৩. কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন : কৃষিখাতে যে সকল ছোট যন্ত্রপাতির দরকার হয় এগুলো কৃষিভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত করা যায়। আর এ ধরনের শিল্প গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করা যায়।
৪. গ্রামীণ ব্যবস্থায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন : গ্রাম অঞ্চলে কৃষি পণ্যে ব্যবহৃত হয় এবং কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে একদিকে শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। মোট কথা দেশের বেকারত্ব নিরসন হবে।
৫. কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা : বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় মৌসুমি ফসল ব্যতীত মাঝখানে অন্য ফসল উৎপাদন বা কৃষি জমিতে একটি ফসল উত্তোলনের পর অন্য ফসল করার উদ্যোগ নিলে কৃষি শ্রমিক বেকার থাকবে না।
৬. ফসলবহির্ভূত চাষাবাদ : বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে নদী-নালা, খাল-বিল, নিচু জমি রয়েছে। এসব জায়গায় বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষ করা যায়। আর উঁচু অঞ্চল ফসল হয় না এমন জায়গায় হাঁস-মুরগির খামার করে বছরের সব সময় কাজ করার সুযোগ হয়।
৭. অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে কর্মমুখী বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করে স্বল্প শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থায় কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।
৮. পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সুবিধা : গ্রামীণ অর্ধ-শিক্ষিত বেকারদের ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদানের পর তাদেরকে আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান করলে হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, গবাদি পশু খামারের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যায়। আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেও গ্রামীণ বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।

অনুসন্ধান কাজ: তোমার এলাকার বেকারত্ব পরিস্থিতির উপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি কর।

৯.৭ মানবসম্পদ (Human Resource)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। কাজেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

মানবসম্পদের সংজ্ঞা (Defination of Human Resource)

জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানব সম্পদ বলে। অর্থাৎ কোনো দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ এবং শিক্ষায় দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তিকে মানব সম্পদ বলে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানব শক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদ এ দুটি-ই জরুরি। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মানব সম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি (Methods of Human Resource Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে নিচের পদ্ধতিসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. শিক্ষা : জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে সকলের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একজন মানুষ নিরক্ষর থাকতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ নয়। তাকে কর্মমুখী শিক্ষাদান করলে মানব শক্তির উন্নয়ন হয়। একজন নিরক্ষর মানুষ ভালো ও দক্ষ চাকী হয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পেশাগত শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। এ উদ্দেশ্যে দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি করা দরকার। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোক তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে।
২. প্রশিক্ষণ : শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত দেশের জনবল অধিক উৎপাদনে সক্ষম। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সমরোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে।
৩. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন : সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। দেশের সব নাগরিককে এ অপরিহার্য উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো দরকার। দেশের যেসব মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও কর্মবিমুখ, তাদের যেকোনো মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়।
৪. খাদ্য ও পুষ্টি : দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে সুস্বাদু খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, কৃষক, শ্রমিকসহ প্রত্যেকেই দেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার।
৫. উপযুক্ত বাসস্থান : স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ বাসস্থান মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং পরিকল্পিত উপায়ে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রপ্তি থেকে করতে হবে।
৬. নারীর ক্ষমতায়ন : শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী সমাজকে কর্মে নিয়োজিত করার উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদেরকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব।
৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা : বাংলাদেশের জনগণের কর্মদক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ মানবসম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও।
২. প্রবৃদ্ধি কি উন্নয়নের অংশ? বুঝিয়ে লিখ।
৩. অনুন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৪. উন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ কী?
৬. কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম উল্লেখ কর।
৭. বেকারত্বের ধারণা দাও।
৮. বেকারত্ব নিরসনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা কর।
২. উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা কর।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় সমূহ বর্ণনা কর।
৪. দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫. বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতিসমূহের ধারণা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উন্নয়ন কী?

- | | |
|------------------------|--|
| ক. প্রবৃদ্ধির একটি অংশ | খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি |
| গ. জাতীয় আয় বৃদ্ধি | ঘ. প্রবৃদ্ধির সাথে অন্যান্য বিষয়ের সুফল |

২. কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতার ফলে-

- i. কৃষক উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করে
- ii. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়
- iii. জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারের প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

করিম একটি ভাড়াকরা স্কুটার চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তাঁর সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি স্কুটার কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি স্কুটার ক্রয় করেন।

৩. করিমের অবস্থাটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত?

- ক. দারিদ্র্যের গতিধারা
- খ. দারিদ্র্য বিমোচন
- গ. দারিদ্র্যের দুইচক্র
- ঘ. দারিদ্র্য হ্রাস

৪. নতুন স্কুটার ক্রয়ের মাধ্যমে করিমের-

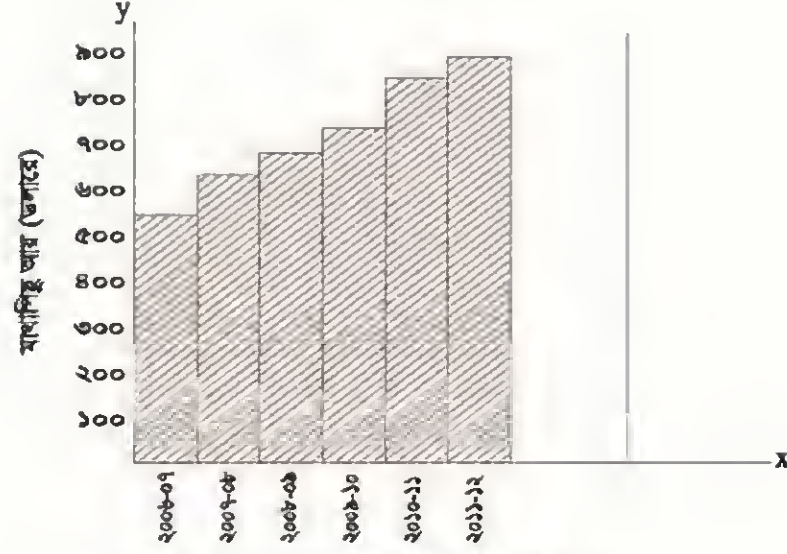
- i. বেকারত্ব দূর হবে
- ii. মূলধন গঠিত হবে
- iii. ভোগ বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
- গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (জুন/১২)

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে?

খ. দারিদ্র্যের দুইচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. লেখচিত্রে কোন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. লেখচিত্রে প্রদর্শিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য কোন নিয়ামক শক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

২. তামান্না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেছে। তার এখনও কোনো চাকুরি হয়নি। ইদানীং সে তার মায়ের পরিচালিত হস্তশিল্পে তার মাকে কাজে সাহায্য করে। মায়ের কাছে থেকে তার সময় ভালো কাটে কিন্তু তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বা আয় পূর্বের অবস্থায় রয়েছে।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে?

খ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা কর।

গ. অর্থনীতিতে তামান্নার কাজের ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা' তামান্নাকে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে- মূল্যায়ন কর।

১০.১ সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance)

অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ-সংক্রান্ত বিবরণী আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। একটি দেশের অসাধারণত্বের সমীচীন কন্যাশ মিলিত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য স্থায়ী সরকার কোন কোন ধাত্রে, কীভাবে, কোন নীতিতে ব্যয় করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়। সরকারি ঋণ নির্বাহের জন্য কীভাবে, কোন কোন উপায় হতে আয় করবে অথবা কোন উপায় থেকে কতটুকু ঋণ গ্রহণ করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

অতএব, অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সরকারি ঋণের উৎস এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

১০.২ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা, দেশ রক্ষা ইত্যাদি কাজে সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস প্রধানত দুটি। কখা- ক) কর রাজস্ব খ) করবাহির্ভূত রাজস্ব

ক) কর রাজস্ব (Tax Revenue)

সরকারি জনগণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে কিছু আয় স্থিতিমূলে জনগণ সরকার থেকে সরাসরি বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা আশা করতে পারে না, তাকে কর বলে। সরকার দেশের নিবাসী বা অনিবাসী ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং গণ্যের উপর যে কর ধার্য করে তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে কর রাজস্ব বলা হয়।



রাজস্ব ভবন

সরকারের কর রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

১) আয়কর ও মুনাফার উপর কর (Taxes on Income and Profit)

কোনো ব্যক্তির বা কোম্পানির আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি অমুত্ব উৎস হলো আয়কর। বর্তমানে বাংলাদেশে কোম্পানি করীত করের বার্ষিক আয় ২,৫০,০০০ টাকা (গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে) ৩,০০,০০০ টাকা (মহিলাদের ক্ষেত্রে) ৩,৭৫,০০০ টাকা (প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) এর অধিক, আয়ের আয়ের উপর এ কর ধার্য করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির মুনাফার উপর কর ধার্য করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৫৬০৮৬ কোটি টাকা।

২) মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax)

অসাধারণ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে ১৯৯১-৯২ সাল থেকে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত মূল্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের প্রায় প্রতিটি স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax- VAT) বলে। বর্তমানে আর্থিক দেশে আমদানিকৃত মূল্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মূল্য একই বিভিন্ন সোনা খাতের উপর আট আরোপ করা হয়েছে। অবশ্যে এ খাতের আওতা অধিক সম্প্রসারিত করা হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৫৫০১৩ কোটি টাকা।

৩) আমদানি শুল্ক (Custom Duties)

বাংলাদেশে সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হলো আমদানি শুল্ক। দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের ও সেবার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১৪৫৯০ কোটি টাকা।

৪) আবগারি শুল্ক (Excise Duties)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, গুদ্রু, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের উপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১২৫১ কোটি টাকা।

৫) সম্পূরক শুল্ক (Supplementary Duties)

বিভিন্ন কারণে সরকার অনেক দ্রব্যসামগ্রীর উপর আবগারি শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর বা আমদানি শুল্ক আরোপের পরেও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করে, তাকে সম্পূরক শুল্ক বলে। যেমন, সিরামিক টাইলসের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২১৩৩৪ কোটি টাকা।

৬) অন্যান্য কর ও শুল্ক (Other Taxes and Duties)

উপরের শুল্ক ও করের মূল পাঁচটি উৎস ছাড়াও আরও কিছু কর ও শুল্ক থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে। যেমন : সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, প্রমোদ কর প্রধান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১৪১৩ কোটি টাকা।

৭) মাদক শুল্ক (Narcotics and Liquor Duty)

মাদক জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর সরকার শুল্ক বসিয়ে অর্থ আয় করে থাকে। এর মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৭৭ কোটি টাকা।

৮) যানবাহন কর (Tax on Vehicles)

বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের উপর যে কর দেয়া হয়, তাকে যানবাহন কর বলে। এ খাত থেকে সরকার প্রতি বছর অর্থ আয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১২৪৮ কোটি টাকা।

৯) ভূমি রাজস্ব (Land Revenue)

ভূমির মালিকানা ও ভোগ দখলের জন্য ভূমির মালিক সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। বাংলাদেশ সরকার ভূমির উপর উন্নয়ন কর আরোপ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৭৩৮ কোটি টাকা।

১০) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (Non-Judicial Stamp)

দলিলপত্র ও মামলা মোকদ্দমার আবেদনপত্র ব্যবহারের জন্য নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়। এ খাত হতে সরকার প্রতি বছর অনেক অর্থ আয় করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৩৫০৯ কোটি টাকা।

খ) করবহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)

সরকার কর ও শুদ্ধ ছাড়া আরও অনেক উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে কর বহির্ভূত রাজস্ব বলে।

সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

১) লভ্যাংশ ও মুনাফা (Dividend and Profit)

সরকার তার মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ব্যাংক, বীমা কোম্পানি এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান, পার্ক, চিড়িয়াখানা) থেকে বছরান্তে লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৪৯৩২ কোটি টাকা।

২) সুদ (Interest)

সরকার, সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। প্রদত্ত ঋণের সুদ হিসেবে সরকার প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৭২৭ কোটি টাকা।

৩) প্রশাসনিক ফি (Administrative Fee)

সরকার জনগণকে প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফি আদায় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৪৫০১ কোটি টাকা।

৪) জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (Fine, Penalty and Confiscation)

দেশের আয় ও নিয়মনীতি পরিপন্থী বিভিন্ন কাজের জন্য সরকার জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ করে প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৪৫৮ কোটি টাকা।

৫) অর্থনৈতিক সেবা (Economic Services)

সরকার তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রপ্তানি আইনের আওতায় প্রাপ্ত ফিস, বাণিজ্য সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন ফিস, বীমা আইনের আওতায় প্রাপ্ত ও সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফিস, সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফিস ইত্যাদি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৪৯৫ কোটি টাকা।

৬) ভাড়া ও ইজারা (Rent and Lease)

সরকারি বিভিন্ন সম্পত্তি ভাড়া ও ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে সরকার প্রতি বছর অনেক অর্থ আয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১৫৯ কোটি টাকা।

৭) টোল ও লেভি (Toll and Levy)

বিভিন্ন সেতু থেকে টোল ও লেভি আদায় বাবদ সরকার কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৪৯৫ কোটি টাকা।

৮) অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় (Non Commercial Sales)

সরকার জনগণের কল্যাণে কোনো কোনো সময় বিনা লাভে অনেক দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৩৮৯ কোটি টাকা।

৯) রেলওয়ে (Railway)

বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীবহন ও দ্রব্যসামগ্রী পরিবহনের ভাড়া বাবদ আয় করে। রেলওয়ে সেবাকে সম্প্রসারণ, আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে এ খাতে মুনাফার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১১০০ কোটি টাকা।

১০) ডাক বিভাগ (Postal Department)

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটি সরকারের আয়ের একটি উৎস। ডাক বিভাগ বহুমুখী সেবা প্রদান করার ফলে ২০০১-০২ সাল হতে এ খাতে আয় প্রবাহ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৯৪ কোটি টাকা।

উপরে উল্লেখিত বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তাই প্রতি বছর সরকারকে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদেশী ঋণ, সাহায্য, দান, অনুদান এসবের উপর নির্ভর করতে হয়।

উৎস : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায় চিহ্নিত কর।

১০.৩ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশ রক্ষা ও পরিচালনা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। গণতন্ত্রের উন্মেষ ও উন্নয়নের ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে অনেক নতুন নতুন খাত ও ব্যয়ের ভালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

১) শিক্ষা ও প্রযুক্তি

সরকার মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তি সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। শিক্ষার সাথে প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৮৭৬৯ কোটি টাকা।

২) প্রতিরক্ষা

দেশকে বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, বেতনভাতা, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রভৃতি প্রদানের জন্য সরকার এ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এ খাতে অনেক ব্যয় বরাদ্দ অপ্রকাশিত থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১২২৪০ কোটি টাকা।



নৌ-ভরী

৩) জনপ্রশাসন

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে জনপ্রশাসন পরিচালনা করতে হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এবং অফিস পরিচালনা বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৫৩২৩৭ কোটি টাকা।



বাংলাদেশ সচিবালয়

৪) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জ্ঞানমালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে ও পরিচালনা করতে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৮৬০২ কোটি টাকা।

৫) কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষি গবেষণা

বাংলাদেশ সরকার কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং ঋণ বিতরণ করছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রথম কৃষি গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেওয়া শুরু করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৪৩৫৩ কোটি টাকা।



কৃষিকাজ

৬) জনস্বাস্থ্য

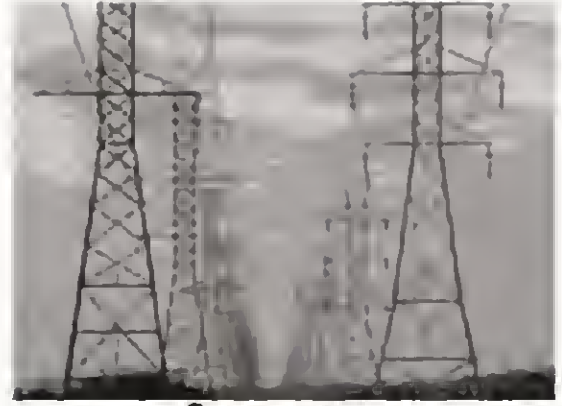
জনগণের সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, মহামারী প্রতিরোধ, ডাক্তার ও নার্সের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। চিকিৎসা সেবা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন এবং সেখানে একজন করে এম.বি.বি.এস ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়েছে। যার ফলে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১৬৯ কোটি টাকা।

৭) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশ সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী, যেমন : বয়স্কভাতা কর্মসূচি, বিধবাবাতা, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে (বিশেষ করে মঙ্গা এলাকার) সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্ব নিরসন, তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এবং বাস্তুহারা গৃহায়ন তহবিল, একশ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার এবং গরিব দুস্থদের মাঝে রেশনিং কাজে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০৭১৬ কোটি টাকা।

৮) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন বৃদ্ধিকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন তহবিল গঠন, প্রভৃতি খাতে প্রতি বছর সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৭৯৫৭ কোটি টাকা।



বিদ্যুৎ সরবরাহ

৯) পরিবহন ও যোগাযোগ

বাংলাদেশের যাতায়াত, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার যোগাযোগ, সড়ক, রেলপথ, নৌ পরিবহন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সেতু বিভাগের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০৪৮৬ কোটি টাকা।

১০) দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান

‘ন্যাশনাল সার্ভিস’ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দুই বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বল্প শিক্ষিত, কর্মঠ ও বেকার যুবকদের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নানারূপ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), খয়রাতি সাহায্য (জিআর), বিজিএফ ও ভিজিডি বাবদ প্রতিবছর ১০ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে। এসব খাতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১১) ঋণ ও সুদ পরিশোধ

সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে। এসব ঋণ এবং ঋণের সুদ পরিশোধ করতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের ঋণ ও সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৯৭৯৬ কোটি টাকা।

১২) শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ

দেশের শিল্প এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এই ব্যয় করে থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পুনর্অর্থায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৭৬৪ কোটি টাকা।



বস্ত্রশিল্প

১৩) পরিবেশ ও বন

পরিবেশ সংরক্ষণ-মানোন্নয়ন, শিল্প দূষণ থেকে রক্ষা, তরল বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ইত্যাদি নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ ব্যয় করে।

১৪) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

সরকার দেশের তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে প্রতি বছর অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৫৩৯ কোটি টাকা।

১৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১২০০৯ কোটি টাকা।

উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরও কয়েকটি খাতে ব্যয় করে, যেমন- মহিলা ও শিশু, পানিসম্পদ, মৎস্য ও পশুসম্পদ, গৃহায়ণ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব বা

অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৫৫টি খাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর প্রায় ১৮টি খাতে ব্যয় করে থাকে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র ধারণার আলোকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে, অনুন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস করে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিধি আরও প্রসারিত করা উচিত।

উৎস : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের তালিকা তৈরি কর।

কাজ : সাম্প্রতিক কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ কর।

১০.৪ বাজেট (Budget)

বাজেট বলতে আয় ও ব্যয়ের সুবিন্যস্ত হিসাবকে বোঝায়। ব্যক্তি তার বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় পায় তা কীভাবে ব্যয় করে তা যদি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়, তা হবে ব্যক্তিগত বাজেট। একইভাবে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে কতটুকু আয় প্রাপ্তির আশা করে এবং বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করতে চায় তার সুবিন্যস্ত হিসাবকে সরকারি বাজেট বলে। বাংলাদেশে আর্থিক বছর হলো জুন থেকে জুলাই।

বাজেট হলো সরকারি অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। বাজেটে যেমন সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে, তেমনি দেশের অর্থনীতির চিত্র ফুটে উঠে। বাজেটে কেবল সরকারি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবই থাকে না বরং আয়

ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কীভাবে ঘাটতি পূরণ হবে এবং ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে সে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কী করা হবে ইত্যাদি বিষয়ও বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদে অনুমোদন নিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে সরকারের নির্ধারিত আয়-ব্যয় ও তার পদ্ধতি কার্যকর হয়।

বাজেটের প্রকারভেদ

সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।



চলতি বাজেট (Current Budget)

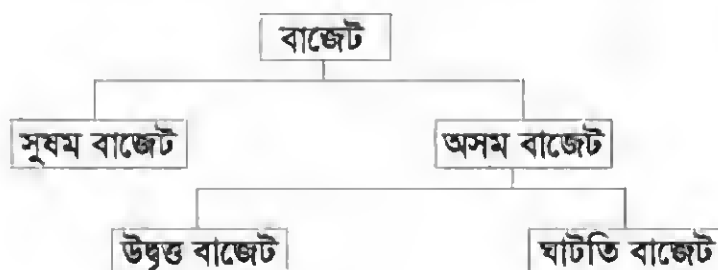
যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে চলতি বাজেট বলে। চলতি আয় সংগৃহীত হয় কর রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব হতে। কর রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মূল্য সংযোজন কর, আয়কর, সম্পত্তি কর ও ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। করবহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা, ঋণের সুদ ইত্যাদি। বাজেটের এ অর্থ ব্যয় হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দেশ রক্ষার জন্য। এ বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো যেমন- শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেহেতু এ খাতগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাই প্রতি বছর বাজেটে এ ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। চলতি বাজেট সাধারণত উদ্ভূত থাকে।

মূলধন বাজেট (Capital Budget)

সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হলো- রাজস্ব উদ্ভূত, বেসরকারি সঞ্চয় ও অতিরিক্ত কর ধার্য করা ইত্যাদি। আর বৈদেশিক আয়ের উৎস হলো- বৈদেশিক ঋণ, দান, অনুদান ইত্যাদি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, পল্লী উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

কাজ : চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দিক থেকে বাজেটকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :



১. সুষম বাজেট (Balanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে এটি সহায়ক নয়।

সূত্র :

$$\text{সুষম বাজেট} = \text{মোট আয়} - \text{মোট ব্যয়} = ০$$

অর্থাৎ, মোট আয় = মোট ব্যয়

২. অসম বাজেট (Unbalanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের অসমতার দিক থেকে অসম বাজেটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

অর্থাৎ, এ বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ বেশি।

$$\text{সূত্র : উদ্বৃত্ত বাজেট} = (\text{মোট আয়} - \text{মোট ব্যয়}) > ০$$

অর্থাৎ মোট আয় > মোট ব্যয়

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

সূত্র : ঘাটতি বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) < ০

অর্থাৎ, মোট আয় < মোট ব্যয়

কাজ : উদ্ভূত বাজেট ও ঘাটতি বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।

কাজ : সুসম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

১০.৫ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আর্থিক বছর জুলাই-জুন। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে পরবর্তী বছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করেন, যা আলোচনা, সমালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজনের পর উক্ত মাসেই মহান সংসদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।



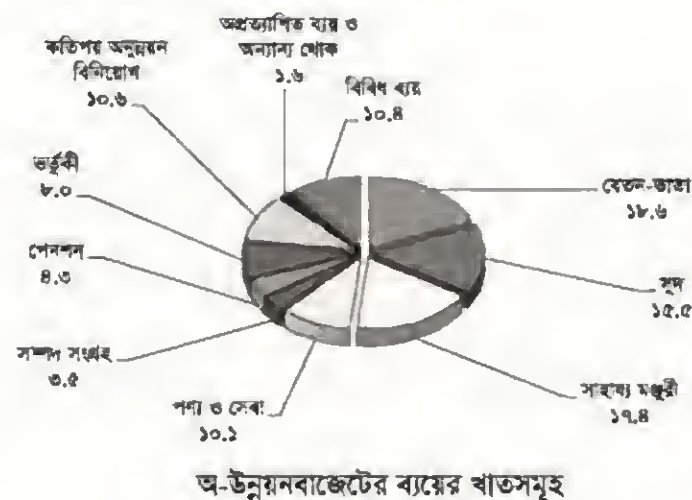
জাতীয় সংসদ

আমাদের দেশে বাজেটকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। যথা-

- ১) অ-উন্নয়ন বাজেট
- ২) উন্নয়ন বাজেট

১) অ-উন্নয়ন বাজেট (Non-Development Budget)

বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন বা চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় তাকে অ-উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশ রক্ষা এবং দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় এ বাজেটে উল্লেখ থাকে না।



অ-উন্নয়ন বাজেটের আয় সংগৃহীত হয় মূলত কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব হতে। আয়ের উৎসগুলো নিম্নরূপ :

কর থেকে আয়	কর বহির্ভূত আয়
আয় ও মুনাফার উপর কর মূল্য সংযোজন কর (VAT) আমদানি শুল্ক আবগারী শুল্ক সম্প্রদায় শুল্ক ভূমি রাজস্ব যানবাহন কর স্ট্যাম্প বিক্রয় মাদক শুল্ক অন্যান্য কর ও শুল্ক	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে লভ্যাংশ ও মুনাফা সুদ থেকে প্রাপ্ত প্রশাসনিক ফি জরিমানা, দ- ও বাজেয়াপ্তকরণ সেবা বাবদ প্রাপ্তি ভাড়া ও ইজারা টোল ও লেভী রেলওয়ে ডাক বিভাগ তার ও টেলিফোন বোর্ড অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব

অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত সমূহ	
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	সামাজিক নিরাপত্তা
জন প্রশাসন	ঋণ ও সুদ পরিশোধ
প্রতিরক্ষা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
পরিবহন ও যোগাযোগ	অপ্রত্যাশিত ব্যয়

২) উন্নয়ন বাজেট (Development Budget)

বাজেটের যে অংশে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে উন্নয়নমূলক বাজেট বলে। এ বাজেটে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং অর্থসংস্থানের উৎসের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তি অর্জন। তাই প্রতিবছর নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নিতে হয়।

উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ :

আয়ের উৎসসমূহ	ব্যয়ের খাতসমূহ
অভ্যন্তরীণ উৎস : ১. অ-উন্নয়ন বাজেটের উদ্ধৃত ২. অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে আয় ৩. অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণ ৪. বন্ডের মাধ্যমে ঋণ বৈদেশিক উৎস: ১. বৈদেশিক সাহায্য ২. বৈদেশিক ঋণ	১. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ৩. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ৫. শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ৬. পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ৭. গৃহায়ন ৮. শ্রম ও জনশক্তি ৯. মহিলা ও যুব উন্নয়ন ১০. অন্যান্য

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোনটি অ-উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন বাজেটের অংশ তা নির্ণয় কর।

১০.৬ এক নজরে বাংলাদেশ সরকারের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট
(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৬-২০১৭
রাজস্ব প্রাপ্তি	কোটি টাকায়
কর রাজস্ব	২,১০,৪০২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩২,৩৫০
বৈদেশিক অনুদান	৫,৫১৬
মোট আয়:	২,৪৮,২৬৮
ব্যয় :	
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৮৮,৯৬৬
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	২৬,৭৭৮
উন্নয়নমূলক ব্যয়	১,১৭,০২৭
রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৫৪
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৪১৪৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১,১০,৭০০
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর	১,৮২৬
মোট ব্যয় :	৩,৪০,৬০৫

সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) :	(-) ৯২,৩৩৭
জিডিপির শতকরা হার :	(-) ৪.৭
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) :	(-) ৯৭,৮৫৩
জিডিপির শতকরা হার :	(-) ৫.০
অর্থসংস্থান :	
বৈদেশিক ঋণ (নীট)	৩০,৭৮৯
বৈদেশিক ঋণ	৩৮,৯৪৭
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	(-) ৮,১৫৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৬১,৫৪৮
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নিট)	৩৮,৯৩৮
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নিট)	২২,৬১০
মোট অর্থ সংস্থান	৯২,৩৩৭

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

বাজেটের মোট আয়তন/ব্যয় :	৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা
মোট রাজস্ব আয় :	২,৪৮,২৬৮ কোটি টাকা
সামগ্রিক ঘাটতি :	৯৭,৮৫৩ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :	১,১০,৭০০ কোটি টাকা
মোট অর্থসংস্থান :	৯২,৩৩৭ কোটি টাকা
অভ্যন্তরীণ ঋণ :	৬১,৫৪৮ কোটি টাকা
যার মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে (নিট) :	৩৮,৯৩৮ কোটি টাকা
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নিট) :	২২,৬১০ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নিট) :	৩০,৭৮৯ কোটি টাকা

উৎস : অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়

এ বাজেটে প্রধানত দুটি অংশ রয়েছে। যথা- অনুন্নয়ন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। আয় ব্যয়ের ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সরকারের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি বাজেট।

কাজ : বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
২. মূল্য সংযোজন কর বলতে কী বোঝায়?
৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়?
৪. চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেট বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলো বর্ণনা কর।
২. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা কর।
৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়? সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটির ওপর আয়কর ধার্য হয়?

ক. ব্যক্তির আয়ের ওপর

খ. কোম্পানির আয়ের ওপর

গ. যানবাহন থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর

ঘ. ভূমি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর

২.



চিত্র : A



চিত্র : B



চিত্র : C



চিত্র : D

কোনটিতে কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ রয়েছে?

ক. চিত্র : A খ. চিত্র : B

গ. চিত্র : C ঘ. চিত্র : D

নিচের সারণিটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি আর্থিক বছরে দুটি দেশের সরকারের গৃহীত বাজেট:-

দেশ-A	
প্রত্যাশিত আয় (টাকা)	প্রত্যাশিত ব্যয় (টাকা)
১০০০ কোটি	১১০০ কোটি

দেশ-B	
প্রত্যাশিত আয় (ডলার)	প্রত্যাশিত ব্যয় (ডলার)
২০ লক্ষ বিলিয়ন	২০ লক্ষ বিলিয়ন

৩. B দেশের বাজেটকে কোন প্রকারের বাজেট বলে?

ক. সুষম খ. অসম

গ. ঘাটতি ঘ. উদ্বৃত্ত

৪. A দেশের মত বাজেট প্রণয়নের ফলে

i. প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে

ii. জনগণের জীবন যাত্রার মান বাড়বে

iii. দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইসরাত একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কেনাকাটা করতে যায়। সে কেনাকাটা শেষে দাম পরিশোধ করে তাকে প্রকৃত দামের সাথে কিছু অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “এটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করা হয়।”

ক. তুমি রাজস্ব কাকে বলে?

খ. সম্পূরক শুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইসরাতের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি রাজস্বের কোন উৎসের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবগারি শুল্কের সাথে ইসরাত প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

২. জাহিদ একটি সরকারি স্কুলে পড়ে। তাদের স্কুলের সবাই খুশি। কারণ এ বছর একটি নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। সে জানতে পারে সরকার এবার তাদের স্কুলে বড় বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। বাজেট কী তা সে বোঝে না। এ প্রসঙ্গে তার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাদের বেতনের মতো এটিও সরকারের এক ধরনের ব্যয় যা বাজেটের মাধ্যমেই সরকার প্রদান করে।

ক. বাজেটের সংজ্ঞা দাও।

খ. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

গ. জাহিদের স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজটি সরকারের কোন বাজেটের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাহিদের শিক্ষকের বেতন কীভাবে উদ্ভূত বাজেটের অন্তর্গত হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২০১৭

শিক্ষাবর্ষ
৯-১০ অর্থনীতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেটারে
১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য